সুন্দরে ইতিবৃত্ত

আবদুল ওয়াহাব খান

আমি
তোমার নিকট
উপস্থাপন করছি সুন্দর ইতিবৃত্ত,
প্রত্যাদেশের মাধ্যমে–
এই কোরআন
অবতরণ
করে–

সুন্দর ইতিবৃত্ত

আব্দুল ওয়াহাব খান

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

হজরত ইউসুফ আ.
এর অবিস্মরণীয় জীবন কথা

সুন্দর ইতিবৃত্ত

আব্দুল ওয়াহাব খান

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার।

৩য় প্রকাশ ঃ জুন ২০০৯

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭,
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ ষাট টাকা।

SOONDAR ETEBRITTA: A life sketch of Hazrat Yusuf (As) written by Abdul Wahab Khan in Bengalee & Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Taka-60.00 U.S.$ 10.

ISBN 984-70240-0034-5

بسم الله الرحمن الرحيم

নবী ও রসূলগণই বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক। তাঁদের জীবনালোচনায় রয়েছে জ্ঞান, হেদায়েত ও মুক্তি। যারাই তাঁদেরকে অস্বীকার করেছে তারাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আর যারা স্বীকার করেছে তারা হয়েছে চিরন্তন জীবনের অক্ষয় বৈভবের অধিকারী।

হজরত ইউসুফ আ. ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ সত্য নবী। তিনি ছিলেন সুন্দর। তাঁর জীবন ছিলো সুন্দর। আল্লাহ্পাক নিজেই তাঁর জীবন বৃত্তান্তের বিবরণ দান করেছেন কোরআনুল করিমের সুরা ইউসুফে। এরশাদ হয়েছে, আমি তোমার নিকট উপস্থাপন করছি সুন্দর ইতিবৃত্ত, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে— এই কোরআন অবতরণ করে.....।

'সুন্দর ইতিবৃত্ত' এলো আমাদের তেইশতম প্রকাশনার প্রতিভু হয়ে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সঙ্গে আমরাও চাই যে, সুন্দর ইতিবৃত্তের ছোঁয়ায় আমাদের জীবনে বয়ে যাক সুন্দরের সয়লাব। নবী ইউসুফ আ. এর নবুয়তি নূরের ছটায় দ্যুতিময় হয়ে উঠুক বিংশ শতাব্দীর নষ্ট সভ্যতার শরীর।

ঘরে বাইরে শত্রু। প্রবৃত্তির প্ররোচনাপ্রভাবিত কাদিয়ানী, মওদুদী, শিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার আজ বিশ্বমানুষের একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। অবিশ্বাসীদের আক্রমণ পরিকল্পনাও চলছে একই সাথে। প্রকৃত বিশ্বাসীরা জেগে উঠুন। সামনে জোয়ার।

দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এসেছে ফেনা
তবু জাগলেনা তবু তুমি জাগলেনা?

সকল স্তুতির অধিকারী আল্লাহ্তায়ালাই। দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ স., তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন এবং নিরাপত্তাপ্রাপ্ত সম্মানিত সাহাবাবৃন্দের প্রতি। আমিন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনূর রশীদ
হাকিমাবাদ কানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
মুকাশিফাতে আয়নিয়া ◆ফোরাতের তীর ◆মহা প্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

এভাবেই ইউসুফকে
আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম;
সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা
বসবাস করতে পারতো।
আমি
যাকে ইচ্ছা তার প্রতিই
অনুগ্রহ করে থাকি,
আমি সৎকর্মপ্রিয়দের শ্রমফল
বিনষ্ট করি না।

—সুরা ইউসুফ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মালেক ইবনে দোবর পানি তোলার জন্য কূপে বালতি ফেললো। কুয়াটি ছিলো পরিত্যক্ত। কিন্তু একথা জানা ছিলো না তার।

আল্লাহ্ কি মেহেরবান। ভাবলেন বালক ইউসুফ। তিনি মনে করলেন, ভাইদের সুমতি হয়েছে হয়তো। তাই তাকে তুলে নেবার জন্য তারা কুয়ায় বালতি ফেলেছে। হৃদয়াকাশে যে মেঘ জমেছিলো এতক্ষণে তা দূর হয়ে গেলো। বালতির দড়ি শক্ত করে ধরলেন তিনি। মনে মনে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।

বালতি টেনে তুলছে মালেক ইবনে দোবর। এতো ভারী লাগছে কেনো? অনেক কষ্টে বালতি উপরে তুলতেই অবাক হয়ে গেলো সে। একি। এ যে দেখছি অনিন্দসুন্দর একটি বালক! সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কি সৌভাগ্য! না চাইতেই একটি গোলাম!

পানির বদলে বালতির সাথে মনুষ্য সন্তানটিকে দেখে সে উৎফুল্ল হলো বটে, কিন্তু বিস্মিত হলো ততোধিক। কুয়ার মধ্যে মানুষ কীভাবে এলো? নাকি জ্বীন! বালকটিকে বার বার নিরীক্ষণ করতে লাগলো সে। পরিচয় জিজ্ঞেস করলো কয়েকবার। কিন্তু তেমন কিছুই বললো না বালকটি।

বালকটিকে নিয়ে আপন কাফেলায় ফিরে এলো মালেক ইবনে দোবর। বালকটির পরিচয় জানতে না পারলেও কাফেলার লোকজন এ অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ হিসাবে ধরে নিলো। বিনা অর্থে গোলাম। খোশ নসিবই বটে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বণিক দলের পণ্য সামগ্রীর মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন।

অন্ধকার গহ্বর থেকে মুক্ত হয়ে বালক ইউসুফও কম আশ্চর্য হননি। আপনজনদের না দেখে কোনো অপরিচিতজন দেখবেন এরকম চিন্তাই করতে পারেননি তিনি। তাঁর আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, একদল সওদাগরের হাতে তিনি বন্দী হয়েছেন এখন।

প্রচুর মুনাফার লোভে বণিকদল বালক ইউসুফকে লুকিয়ে ফেললো। তারা বিশেষভাবে নজর রাখলো বালকটি যেনো পালাতে না পারে। লোক জানাজানি যেনো না হয় সে ব্যাপারে তারা অবলম্বন করলো কঠোর সতর্কতা।

হজরত ইউসুফ আ. নিজেকে মুক্ত করার কোনো চেষ্টাই করলেন না। অন্ধকূপের মৃত্যুবিভীষিকা এবং আপনজনদের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এ বন্দীত্ব অনেক ভালো। ভবিষ্যৎ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌রই হাতে। মঙ্গলামঙ্গলের এখতিয়ার তো একমাত্র তাঁরই।

কাফেলা চলতে শুরু করলো। পাহাড় প্রান্তর জনপদ পার হয়ে গেলো একে একে।

কাফেলাটি এসেছে হেজাজ থেকে। তৎকালে শ্যাম, হেজাজ এলাকার বণিকেরা সুগন্ধি দ্রব্যাদি এবং মশলাপাতি নিয়ে এই পথে মিশর গমন করতো। মিশরে এগুলোর চাহিদা ছিলো প্রচুর। মূল্যও ছিলো বেশ চড়া। ফেরার পথে মিশর থেকে তারা বস্ত্রাদি, তৈজষপত্র ইত্যাদি নিয়ে আসতো হেজাজে।

কাফেলা এগিয়ে চলে মিশর অভিমুখে। সাথে সাথে চলেন বালক ইউসুফও। নির্বিকার। ভাবলেশহীন। সামনে কোন্ অনিশ্চিত জীবন কে জানে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিতার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে হজরত ইউসুফ আ. ছিলেন একাদশতম। সব চেয়ে ছোট বিন ইয়ামিন তাঁরই সহোদর। অন্যান্য দশজন তাঁর সৎভাই। হজরত ইয়াকুব আ. এর এই দশ সন্তান ছিলো অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভজাত। তারা বেশ সংঘবদ্ধ এবং পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো। কিন্তু হজরত ইউসুফ এবং বিন ইয়ামিনের প্রতি তারা মোটেই সহানুভূতিশীল ছিলো না। এই দুই ভাইকে তারা হিংসা করতো।

হজরত ইউসূফ আ. ছিলেন বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের অধিকারী। শান্তশিষ্ট, ভদ্র-নম্র স্বভাবসম্পন্ন। সচ্চরিত্রতা এবং সত্যবাদিতা ছিলো তার স্বভাব-গুণ। এ কারণে পিতা ইয়াকুব আ. এর স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হজরত

ইয়াকুব আ. পুত্র ইউসুফ এর মধ্যে নবুয়তী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি জানতেন আল্লাহ্‌র দ্বীনের হেফাজতকারীদের জন্য শয়তান প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ইউসুফ নিতান্তই বালক। শয়তানকে প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না হয়তো। এজন্য সমূহ ক্ষতির আশংকায় কখনো তিনি চোখের আড়াল হতে দেননি তাঁকে। বিন ইয়ামিন তখন নিতান্তই ছোট। সেও চরিত্র মাধুর্যে ইউসুফ-এরই প্রতিচ্ছবি। এ দুই সন্তানের প্রতি পিতার স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্য বৈমাত্রেয় দশভাই হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

হজরত ইয়াকুব আ. চারটি বিবাহ করেছিলেন। দুজন ছিলেন সহোদরা এবং তাঁরই আপন ফুফাতো বোন। অন্য দুজন ছিলেন দুই স্ত্রীর খাদেমা।

প্রথমা স্ত্রীর নাম ছিলো লাইয়া বিনতে লাবান। তিনি রাতবীন, শামাউন, রাওয়া, ইয়াহুদ, দাইসাকার এবং বালাবুন এই ছয় সন্তানের জন্মদাত্রী।

দ্বিতীয়া স্ত্রী রাহীল বিনতে লাবান। তিনি সুযোগ্য দুই সন্তানের জননী। তাঁরা হলেন— হজরত ইউসুফ আ এবং বিন ইয়ামিন।

যুলফা ছিলেন হজরত ইয়াকুব আ. এর তৃতীয়া স্ত্রী। তিনি লাইয়ার খাদেমা ছিলেন এবং ছিলেন যাদ ও আশীর নামের দুই সন্তানের জননী।

চতুর্থা স্ত্রী বালহা ছিলেন রাহীলের খাদেমা। দান এবং নাফতালা তাঁরই গর্ভজাত সন্তান।

হজরত ইউসুফ আ. এবং বিন ইয়ামিন ব্যতীত অন্যান্য দশভাই ছিলো বয়সে বড়ো এবং স্বাস্থ্যবান যুবা পুরুষ। মাঠে বকরী চরানোই ছিলো তাদের প্রধান কাজ। তারাই ছিলো সংসারের অর্থ উপায়ের একমাত্র অবলম্বন। ছোট দুই সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্য পিতার উপর তারা অসন্তুষ্ট ছিলো। আর এজন্য হজরত ইউসুফ আ. এবং বিন ইয়ামিনকেই দায়ী করতো তারা। বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছোট ভাই দুটোও সুযোগ সন্ধানী। পিতার স্নেহ ভালোবাসার একচেটিয়া দখলকারী তারা। বড়রা ভাবলো— আমরাও পিতা-মাতার স্নেহের সম অংশীদার। এক অকর্মণ্য বালক এবং একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মধ্যে পিতার ভালোবাসা কেন্দ্রীভূত হতে দেয়া যায় না। এভাবে চলতে পারে না। এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়, সে ব্যাপারে তারা চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালক ইউসুফ একদিন স্বপ্ন দেখলেন— এগারটি তারকা, চন্দ্র এবং সূর্য তাঁকে সিজদা করছে। কি অদ্ভূত স্বপ্ন! কোনো অর্থপূর্ণ ইংগিত নিশ্চয় আছে এর মধ্যে। পিতাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালেন ইউসুফ। বিজ্ঞ পিতা। এ খোয়াবের মর্ম উদ্ধার করা তাঁর কাছে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। স্বপ্নের বিবরণ শুনে একাধারে তিনি উৎফুল্ল এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর সন্তানকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত জীবনের ইতিবৃত্তের ইংগিত দিয়েছেন। আনন্দিত হলেন এ জন্য। আর চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, স্বপ্নের কথা প্রকাশিত হলে তাঁর সৎভায়েরা ঈর্ষান্বিত হবে এবং অনিষ্ট সাধনে তৎপর হবে। পুত্রকে একান্ত সান্নিধ্যে ডেকে নিলেন হজরত ইয়াকুব। চুপে চুপে বললেন— স্বপ্নে তোমার উচ্চ মর্যাদার ইংগিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তোমাকে বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্য মনোনীত করবেন। পৃথিবীতে তাঁর দ্বীন প্রসারের জন্য তোমাকে সূক্ষ্ম জ্ঞানসমূহ শিক্ষা দিবেন। তোমার পিতামাতা অর্থাৎ সূর্য এবং চন্দ্র, তোমার ভাইয়েরা এগারটি তারকার প্রতীক— এদের সবার উপরে তোমাকে সম্মানিত করবেন আল্লাহ্তায়ালা। কিন্তু সাবধান! এ খোয়াবের কথা তুমি কাউকে জানাবে না। এমনকি তোমার আপন ভাইকেও না। এ স্বপ্নের মর্মোদ্ধার করা তোমার সৎভাইদের পক্ষে মোটেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে না। তারা ঈর্ষান্বিত হবে এবং নানাভাবে তোমার ক্ষতি সাধনে তৎপর হবে। চির দুশমন শয়তানের কথাও ভুলে যেও না। সে তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমার সৎভাইদেরকে অসৎ কাজের দিকে প্ররোচিত করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের অন্তরেই বাসা বাঁধে শয়তান। এখান থেকেই মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় সে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করে। হজরত ইউসুফ আ. এর সৎভাইদেরকে দিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলো শয়তান। সফলকামও হলো।

সৎভাইয়েরা পরামর্শ করতে লাগলো, কিভাবে দুশমন ইউসুফকে চিরতরে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে ফেলা যায়? এ কাজে কামিয়াব হলে স্বাভাবিকভাবেই তারা পিতার সুদৃষ্টিলাভে সক্ষম হবে। কীভাবে তা সম্ভব? নানা জনের নানা মত, নানা কৌশল। অধিকাংশের মত চরম ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে। মাথা থাকবে না— ব্যথাও থাকবে না। এরপর আমরা ভালো হয়ে যাবো। পিতার মনোতুষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকবো।

বড় ভাইটি কিন্তু সবার সাথে একমত হতে পারলো না। বড়োরা সাধারণতঃ হুট করে কোনো কাজ করে না। কাজ করার আগে পরিণতির কথাও তারা ভাবে। তাই সে বললো— আমার কথা শোনো, ইউসুফকে হত্যার পরিকল্পনা বাদ দাও।

—তাহলে! সবাই জানতে চাইলো।

চলো দূরে কোথাও ফেলে আসি ওকে। পথ হারিয়ে দেশান্তরী হোক ইউসুফ। অথবা অন্ধকূপে ফেলে দাও। না খেতে পেয়ে এমনিতেই মারা পড়বে। নয়তো কোনো পথিক তুলে দূর দেশে নিয়ে যাবে। সে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে, আমরাও হত্যার দায়মুক্ত থাকবো। হত্যা করলে একদিন তা প্রকাশ হবেই। তখন আমরা কলংকিত হবো।

অনেক ভেবেচিন্তে বড়ো ভাইয়ের পরামর্শ মোতাবেক ইউসুফকে অন্ধকূপে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্তই তারা নিলো। কুচক্রীদের সহায় শয়তান। শয়তান তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। দশভাই উপায় খুঁজছিলো, কীভাবে ইউসুফকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে আনবে। কীভাবে পিতার কাছে সন্দেহাতীত থাকা যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে একটা পরিকল্পনা খাড়া করলো তারা। শয়তানই এই পরিকল্পনার উপায় বাতলে দিলো।

পরিকল্পনা মাফিক চক্রান্তকারীরা পিতা হজরত ইয়াকুব আ. এর দরবারে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলো। সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে যায়, কথাবার্তা বলে, কুশলাদি জিজ্ঞেস করে। ইউসুফ এবং বিন ইয়ামিনের খোঁজ খবর নেয়। পুত্রদের

এমনি পরিবর্তন দেখে পিতা আশ্চর্য হন। এভাবে বেশ কিছুদিন গত হলো। তাদের ধৈর্যও কমে এলো। সুযোগ মতো কথাটা পিতার কাছে বললো একদিন। বললো তারা, আব্বাজান! ইউসুফকে আপনি এভাবে ঘরে আটকে রেখেছেন কেনো? এতে ক্ষতিই হচ্ছে। ও ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে ওকে আমরা সাথে নিয়ে যাবো। মুক্ত বাতাসে ঘুরবে, বুনো ফলমূল খাবে। ওর স্বাস্থ্যও ভালো হবে। আমরা মেষ চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকি। ও আমাদের মাল সামানার জিম্মাদারী হয়ে আমাদের কাজে সহায়তা করতে পারবে।

ছেলেদের কথা শুনে হজরত ইয়াকুব আ. অনেকক্ষণ নির্বাক বসে রইলেন। কি করবেন সহসা ভেবে পেলেন না। এর মধ্যে চক্রান্তের কোনো গন্ধ আছে কিনা অনুধাবন করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর নবুয়তী জ্ঞানের সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁকে শংকামুক্ত হতে দিচ্ছে না। অতঃপর তিনি ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যা বলছো তা অনেকটা সত্য। কিন্তু ওতো নিতান্তই বালক। বাইরের পরিবেশের সাথে পাল্লা দিয়ে চলার শক্তি এখনো অর্জন করতে পারেনি।

ছেলেরা বললো, আব্বাজান, ধারণা আপনার ঠিক নয়। এভাবে থাকলে ও আজীবন বালকই থেকে যাবে। ওর ভালোর জন্য বলছিলাম। ও আমাদের ভাই, আমাদের মতোই ওর গড়ে ওঠা উচিত। আমরা নিজেদের মতো করে ওকে পেতে চাই।

—তা বটে। বললেন পিতা। তোমাদের অমনোযোগিতার জন্য ইউসুফ এর কোনো ক্ষতি হয় এই আমার আশংকা। তাছাড়া তোমরা যে এলাকায় বকরী চরাতে যাও ওখানে নেকড়ে বাঘের ভয়ও আছে।

ছেলেরা বললো, আপনি অযথাই দুশ্চিন্তা করছেন। আমরা একটা সংগঠিত দল। তাছাড়া ইউসুফ আমাদেরই ভাই। আমরা ওর প্রতি অবহেলা করবো একথা কি করে ভাবতে পারেন আপনি? ওর ভালোর জন্যই বলছিলাম।

পিতা বললেন, তোমরা এতো করে বলছো এবং মনে হচ্ছে ওর ভালোর জন্যই বলছো। ইউসুফের ব্যাপারে তোমাদের আন্তরিকতার অভাব নেই জেনে খুশী হলাম। ওকে আর আগলে রাখা ঠিক হবে না। তবে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমরা কিন্তু হুঁশিয়ার থেকো।

ইউসুফের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করলো তারা। এভাবে পিতাকে ফুসলিয়ে তাঁকে ঘর থেকে, পিতার স্নেহের নীড় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হলো তারা।

বালক ইউসুফ। সে জানে না কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। ভাইয়েরা মেষ শাবকের মতো কোলে-কাঁধে, আদর-সোহাগে বয়ে নিচ্ছে তাকে। পিতাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে তারা। পিছন ফিরে দেখছে না একবারও। তারা জানে পিতার দৃষ্টি বহুদূর অনুসরণ করবে তাদেরকে।

আসলে তারা কিছুই জানে না। পিতা হজরত ইয়াকুব আ. আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা। তিনি যা জানেন তারা তা জানে না। তবুও আপাত সাফল্যে আত্মহারা তারা। অনেক দূর পর্যন্ত আদর যত্নের সঙ্গে ইউসুফকে নিয়ে চললো সবাই। তারপর পিতার দৃষ্টির আড়াল হতেই তারা ইউসুফের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করলো। পরম সোহাগে যাঁকে এতক্ষণ কাঁধে নিয়ে চলছিলো, তাঁকে এবার জঞ্জালের মতো আছড়ে ফেললো মাটিতে। তারপর চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো সামনের দিকে।

ভাইদের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে ইউসুফ তো হতভম্ব। ভাবতে কষ্ট হয়, ওরা তার ভাই। মুক হলো তার মুখের ভাষা। কেঁদে ফেললো ইউসুফ। কিন্তু কচি হৃদয়ের আকুল আর্তি তাদের পাষাণ হৃদয়ে সহানুভূতি জাগালো না। কেউ চিমটি কাটলো। কেউ ধাক্কা দিলো। আবার কেউ ব্যঙ্গ করে বললো আহা, আদরের ভাইটি মোদের, রাজা হবার খোয়াব দেখে। মারহাবা! মারহাবা! স্বপ্ন দেখলে তো এরকমই দেখা উচিত। কিন্তু বাছা, বাবার নরোম বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাদশাহ্ হয়েছো। এবার বাস্তবে সম্রাট বানিয়ে সোনার মুকুট পরিয়ে দেবো। চিত্তের সুখ আরো বেড়ে যাবে।

ইউসুফের নিষ্ঠুর প্রকৃতির ভাইয়েরা তাঁকে এভাবে নির্যাতন করে নিজেদের মর্মজ্বালা নেভাতে থাকে। গন্তব্যে পৌঁছে তারা ইউসুফকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেললো। নিকটেই ছিলো একটি কূপ। সেই দিকেই তারা নিয়ে চললো ইউসুফকে। তারপর কূপের মধ্যে ফেলে দিলো তাকে। দীর্ঘদিন ধরে অন্তরে লালিত প্রতিহিংসা এভাবেই চরিতার্থ করলো ইউসুফের সৎভাইয়েরা। এবার অন্ধকূপেই মরুক সে। ভাইয়েরা এই চায়। কিন্তু নিয়তি যে অন্য রকম। জীবনমৃত্যুর মালিক তো এক আল্লাহ্‌তায়ালা। তিনি যা চান তাই-ই হয়। কিন্তু ক'জন মানুষ বোঝে একথা।

এ বিপদ মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এতো বড়ো একটা নির্দয়, নিষ্ঠুর সংঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য নেই ইউসুফের। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর তাই আত্মসমর্পণ করলো সে। বিশ্ববিধাতার এক প্রিয়তম সৃষ্টি মৃত্যুর মত বিভীষিকাময় অন্ধকূপে অসহায়ের মতো মহাপ্রভুর সাহায্যের আশায় প্রতীক্ষমাণ।

আল্লাহ্‌র কি মহিমা! হজরত ইউসুফ আ. এর নিরাপত্তার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিলেন। আর এভাবেই তাঁর নিগুঢ় রহস্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর সাহায্যের হাত যাঁর প্রতি প্রসারিত হয় তাঁর ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে কে?

হজরত ইউসুফ আ. এর সৎভাইয়েরা ছিলো স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন। ঐশ্বরিক জ্ঞান তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। পরন্তু শয়তানী প্রভাবে পড়ে তারা হয়ে ওঠে হিংসুটে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। এ ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন যেনো কলুষমুক্ত থাকে এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা জাগে সে শিক্ষা দেওয়াই ছিলো মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। অপরপক্ষে হজরত ইউসুফ আ.কে পৃথিবীর বুকে প্রতিনিধির দায়িত্ব দিতে চান বলেই মহান আল্লাহ্‌ তাকে ঘাত প্রতিঘাত এবং চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চান— যেনো কোন খাদ না থাকে। বিশ্ব স্রষ্টার এটাই নিয়ম। দুনিয়ার বুকে যিনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁকে নিখুঁত হতে হবে। হতে হবে আগুনে পোড়া খাঁটি সোনার মতো। তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাঁর প্রিয়তম বান্দারা কখনো বঞ্চিত হন না। তাই এই চরম বিপদের দিনে তিনি ইউসুফ আ.কে শুনালেন আশ্বাসবাণী—

‘হে ইউসুফ! ভীত হয়ো না অচিরেই এমন দিনের সাক্ষাৎ পাবে, যখন তোমার ভাইয়েরা তোমাকে চিনবে না এবং তুমি তাদেরকে তাদের কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আপাতত সমস্যা মিটলো। পথের কাঁটা, জানের দুশমন বিদায় হলো। কিন্তু স্থুলবুদ্ধি মানুষ জানে না এক সমস্যার পিছনেই আর একটি সমস্যা ওঁৎ পেতে থাকে। একটি শেষ হতেই অপরটি হাজির হয়। ইউসুফকে সরানো গেলো বটে কিন্তু, ঝামেলা আরো বাড়লো। পিতার কাছে, ইউসুফের অনুপস্থিতির কি সমাধান দেয়া সম্ভব যা বিশ্বাসযোগ্য হবে? মহাভাবনায় পড়ে গেলো চক্রান্তকারীরা।

চক্রান্তকারীদের দোসর ইবলিস। তাদের উর্বর মস্তিষ্কে শয়তানী প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। কৃত অপকর্ম সামাল দেবার সমাধান পেয়ে গেলো শয়তানের প্ররোচনায়। দশভাই মিলে একটা পরিকল্পনা খাড়া করলো অবশেষে।

বেশ দেরী করে তারা বাড়ীর পথ ধরলো। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাড়ীর নিকটবর্তী হয়ে দশ ভাই মিলে কান্নাকাটি শুরু করলো। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তারা পিতার সম্মুখে হাজির হলো। পুত্রদের মাঝে প্রাণপ্রতীম ইউসুফকে না দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন হজরত ইয়াকুব। বললেন, তোমাদের বকরীর পালে কি ডাকাত পড়েছে? তোমরা এমন করছো কেনো? ইউসুফ কোথায়? ওকে তোমরা কি করেছো?

তারা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো— আব্বাজান, আমাদের কথা হয়তো বিশ্বাস হবে না আপনার, সত্য বলছি, আমরা ওর কোনো ক্ষতি করিনি। জংগলের ভিতর খোলা প্রান্তরে আমরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছিলাম। ইউসুফকে আমাদের মাল-সামানার পাশে বসিয়ে রেখেছিলাম। ফিরে এসে ওর রক্তমাখা জামা ছাড়া আর কিছু পাইনি। মনে হয় ওকে নেকড়ে বাঘে নিয়ে গেছে। রক্তমাখা জামাটি তারা পিতার হাতে দিলো। হজরত ইয়াকুব আ. জামাটি নেড়েচেড়ে দেখলেন।

স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হজরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানেরা জানে না একটি মিথ্যাকে আর একটি মিথ্যা দিয়ে চাপা দেয়া যায় না। হজরত ইউসুফ আ. এর জামাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হজরত ইউসুফ আ.কে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দশভাই একটি বন্য জন্তু জবাই করে সেই রক্ত তার জামায় মাখিয়ে নিয়েছিলো।

আল্লাহ্‌র নবীর চোখে ধূলো দেয়া কি এতই সহজ। সব বুঝলেন তিনি। ছেলেদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তাঁর কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। পুত্রদের দুর্বল যুক্তি তিনি মানলেন না। ইউসুফের নিরাপত্তার কথা ভেবে মন তার হাহাকার করে উঠলো। চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। তিনি তো পিতা। জন্মদাতা। কি দিয়ে তিনি প্রিয়তম পুত্রের অভাব ভুলবেন? পুত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন— তোমরা যে যুক্তি খাড়া করেছো তা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। রক্তমাখা জামাটি পুত্রদের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। তার পর বললেন, দেখো, জামাটি কোথাও ছেড়া নেই। বাঘে আক্রমণ করলে অবশ্যই জামাটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যেতো। তোমরা ধোকা দিতে চাইছো আমাকে। কিন্তু আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ে গেছে। এতোক্ষণে তারা বুঝতে পারলো পরিকল্পনার মধ্যে কতো ফাঁক রয়ে গেছে। পিতার যুক্তি খণ্ডন করার ভাষা তাদের নেই। তাই তারা অবনত মস্তকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণই নবী রসূলগণের আদর্শ। হজরত ইয়াকুব আ. আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন ছিলেন। এ সংকট মুহূর্তে নিজেকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

করার জন্য করুণাময়ের কাছে পানাহ্ চাইলেন। ধৈর্যশীলদের তিনি বড়ই পছন্দ করেন। ইউসুফের হেফাজতকারী তো সেই মহাপ্রভু নিজেই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস— ইউসুফের কোনো ক্ষতি হবে না। শুধু তার বিচ্ছেদ ব্যথাই মর্ম যাতনা দিচ্ছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপদে ধৈর্য ধারণ আর সুসময়ে শোকর করাই তো নবী রসূলগণের স্বভাব। তবু তাঁরা মানুষ তো বটে। ইউসুফকে হারিয়ে হজরত ইয়াকুব আ কেঁদেছেন। ধৈর্যও অবলম্বন করেছেন। পুত্রের সাফল্যের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এবং তাঁর পয়গম্বরী জ্ঞানের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষতি করতে পারে কে? কিন্তু তিনি যে পিতা। পুত্র স্নেহের নেয়ামত তো আল্লাহ্পাকই দিয়েছেন তাঁকে। সেই স্নেহের সূত্র ধরেই এসেছে শোক। প্রিয়তম পুত্রের বিচ্ছেদের অনল।

আল্লাহ্তায়ালার পরিকল্পনায় কোনো খুঁত নেই। কুশলী তিনি। রহস্যময় তাঁর কার্যকলাপ। এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি একদিকে হজরত ইয়াকুব আ. এর ধৈর্য-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিচ্ছেন। অন্যদিকে হজরত ইউসুফ আ.কে নানা প্রক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গড়ে নিতে চাইছেন আগামী দিনের নবী হিসাবে।

শৈশবাবস্থা থেকে হজরত ইউসুফ আ. এর মধ্যে নবুয়তী বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাই চরম দুর্দিনেও তাঁর ভিতর বাহির কোথাও নৈরাশ্যের কালো ছায়া রেখাপাত করতে পারেনি। নিতান্ত অল্প বয়সে পিতা-মাতার স্নেহ নীড়, স্বজন, মাতৃভূমি ছেড়ে একদল কট্টর ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে কৃতদাস হয়ে এবার তিনি চলেছেন মিশর দেশের দিকে। তারপর কি— কে জানে? শুধু মনে পড়ে পিতার কথা। ছোট ভাই বিন ইয়ামিনের কথা। ইউসুফকে না দেখে কাঁদবেন পিতা। কাঁদবে ছোট ভাইটি। তারপর এক সময় হয়তো সবাই ভুলে যাবে তার কথা। ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এটাই নিয়ম। এই নিয়মের অনিবার্যতার জন্যই পৃথিবী থেমে থাকেনি— থাকবে না। মহামহিম আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের যা ইচ্ছা তাই হবে। তাঁর ইচ্ছার উপরই নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার অর্পণ করে বণিকদলের সাথে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন হজরত ইউসুফ।

কাফেলা এগিয়ে চললো। বিদায় পিতা-মাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন। বিদায় জন্মভূমি কেনান। বিদায়লগ্নে হজরত ইউসুফের চোখ দুটো অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলো মনের অজান্তেই। স্বজন আর জন্মভূমির মায়ায় কার মন না কাঁদে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিশর। নীল নদ বিধৌত মিশর। পিরামিড আর ফেরআউনদের শহর মিশর। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সালের মিশরে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করলেও মিশরীয়রা রাজনৈতিক জীবনে ছিলো বিশৃংখল। তাদের আত্মকলহের সুযোগে বিদেশী শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। এই বিদেশীরা ছিলো হেজাজ-ফিলিস্তিনের অধিবাসী। মিশরে তারা ফেরআউন উপাধি নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করতে থাকে। ইতিহাসে তাদেরকে আমালিক বলা হয়। এই আমালিক শাসকরা বংশানুক্রমে ফেরআউন উপাধি নিয়ে রাজ্য শাসন করে যাচ্ছিলো। তারা এতো শক্তিশালী ছিলো যে তাদের বিরুদ্ধে মিশরীয়রা প্রকাশ্য প্রতিবাদ করার সাহস করতো না। মনে মনে তারা আমালিকদের ঘৃণা করতো। এই ঘৃণার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো— বিদেশী শাসকরা তাদের দেবদেবীদের মানতো না। তারা নিজেদের দেবদেবীর উপাসনা করতো এবং নিজেদের ধর্মমত মিশরীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো। যদিও উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিলো পৌত্তলিকতার ভ্রান্ত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের পূজার উপকরণগুলো ছিলো ভিন্ন ভিন্ন।

মহান স্রষ্টার কি কৌশল। মিশরীয়দের ইচ্ছা বিদেশীরা তাদের ধর্মমত গ্রহণ করুক। বিদেশীদের ইচ্ছা তাদের নিজস্ব ধর্মমত মেনে নিক মিশরবাসীরা। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মিশরে প্রতিষ্ঠিত হোক একত্ববাদের নেয়ামত। তাই তিনি নিজের পরিকল্পনার ছকে হজরত ইউসুফ আ.কে এনে হাজির করলেন মিশরে। অথচ এই পরিকল্পনার নিগূঢ় রহস্য কেউ জানলো না, কেউ বুঝলো না, কেউ কল্পনাও করলো না। বাজারে বিক্রির জন্য হাজির করা হলো ইউসুফকে। রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেলো চতুর্দিকে। এতো সুন্দর গোলাম। এ গোলাম যে রাজা বাদশাহ্‌দের চেয়েও সুন্দর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজিজে মিশরের মনে শান্তি নেই। নীলনদ বিধৌত বিশাল মিশর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তিনি। বিত্ত-বৈভব মান সম্মানের ঘাটতি নেই। ঘরে ষোড়শী সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু উত্তরাধিকারী নেই কোনো। সন্তান লাভের প্রচেষ্টার ত্রুটি করেননি তিনি। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণ করা ছিলো আজিজে মিশরের প্রতিদিনের অভ্যাস। এর ব্যতিক্রম হয় না কখনো। প্রায়ই তিনি বাজারের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। একদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় ফুটফুটে এক বালক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লেন তিনি।

এটা মানুষ বিক্রির হাট। পণ্যসামগ্রীর মতো মানুষও বিক্রি হয় এখানে। হজরত ইউসুফ এখন পণ্য। বিক্রি হবার অপেক্ষায়।

বিচক্ষণ লোক আজিজে মিশর। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলেন এ বালকটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্লভ। তিনি স্থির করলেন, যে কোনো মূল্যে হোক একে হস্তগত করতেই হবে।

উদ্ধারকারী বণিকদল মোটা অংকের অর্থ লাভের আশায় হজরত ইউসুফকে গোলাম হিসাবে কুক্ষিগত করেছিলো কিন্তু সে আশা সফল হলো না তাদের। আজিজে মিশর তাদের সন্দেহ করলেন। এমন অনিন্দসুন্দর ছেলেটি নিশ্চয় কোনো ভদ্র ঘরের সন্তান। বণিকদল হয়তো তাকে চুরি করে এনেছে। তিনি তাদের ভয় দেখিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করতে চাইলেন। আজিজে মিশরের সন্দেহের কারণে বণিকদল ভয় পেয়ে গেলো। ইউসুফের বিনিময় হিসাবে চড়া মূল্য চাইবার সাহস করলো না তারা। সঠিক তথ্য জানতে না পারলেও খুব সামান্য মূল্যেই তাঁকে কিনে আনলেন আজিজে মিশর। মূল্য হিসাবে তা খুবই নৈরাশ্য জনক, যদিও পণ্য হিসাবে তিনি ছিলেন অতি উত্তম। বণিকদের আশায় ধূলি নিক্ষিপ্ত হলো।

বাড়ীতে এসে স্ত্রী জুলেখার হাতে তিনি তুলে দিলেন ইউসুফকে। বললেন, ছেলেটির যত্ন নিও। হয়তোও আমাদের কাজে আসবে। ভবিষ্যতে ওকে আমরা সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। মনে হচ্ছে আমাদের অভাব পূরণ হবে। আজিজের অন্তরে সন্তানাকাঙ্ক্ষা লতিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু পর কি কখনো আপন হয়?

নবম পরিচ্ছেদ

আজিজে মিশরের ঘরে দিন দিন বেড়ে উঠেন হজরত ইউসুফ। বালক ইউসুফের ভূবন মোহিনী চেহারা, ভদ্র-নম্র স্বভাব, সদাচার, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা আজিজে মিশর এবং জুলেখার মনে আলোড়ন তোলে। স্নেহ্ ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেন তাঁরা। তাদের বুভুক্ষু হৃদয়ে আসে এক অনাবিল প্রশান্তি। মনের কোণে ঝলসে উঠে ক্রমবর্ধমান আশার আলো।

মরুচারী বেদুঈন সন্তান হজরত ইউসুফ আ.। মরুদ্যানে মেষ চরানোই তাঁদের পারিবারিক পেশা। তাদের জীবন রুক্ষ মরু পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। তবে হজরত ইয়াকুব আ. এর পরিবারবর্গ প্রকৃতির রুক্ষতা থেকে অনেকটাই মুক্ত। কারণ দুনিয়ার বুকে তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বকারী নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বেহেশতি প্রেমরসে জীবন তাঁদের সিক্ত। আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মহীয়ান তাঁরা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, যিনি— দুনিয়ায় যাকে বাদশাহী তখতে বসাতে চান, তাঁকে তিনি অতিপ্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক উভয় বিষয়ে জ্ঞানবান করে নেন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায়। তা একমাত্র মহাপরাক্রমশালী পবিত্র শক্তির পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে হজরত ইউসুফের প্রশিক্ষণ চলছে। মিশরের প্রধানমন্ত্রী আজিজগৃহে ইউসুফের বৈষয়িক জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ হলো। কথাবার্তা, চাল চলন, আচার ব্যবহার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা বিকাশের মূল ভিত্তি তৈরী হলো এখানেই। একজন বিশ্বস্ত এবং যোগ্য উত্তরাধিকারীর ন্যায় আজিজে মিশরের সংসারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে এসে পড়লো।

আজিজে মিশরের ঘরে পুত্রস্নেহে বেড়ে উঠেন হজরত ইউসুফ আ.। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর শারীরিক গঠনের পরিবর্তন হলো বিস্ময়কর রকমের। এমনিতেই তিনি আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের অধিকারী। যৌবনে তা বিকশিত হলো ষোলকলায়। এক অবর্ণনীয় বেহেশতি রূপ মাধুর্য চমকাতে থাকে তাঁর সমস্ত দেহজুড়ে। নারী পুরুষ সকলেই তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। এ কেমন পাগল করা রূপ। এর কোনো বিবরণ নেই। মানুষ কখনো এতো সুন্দর হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

আজিজপত্নী জুলেখার মন থেকে পুত্রস্নেহের শেষ অনুভূতিটুকু মুছে যায় নিজের অজান্তেই। ইউসুফের দেহের, চলন-বলন, কথাবার্তার পরিবর্তনের সাথে জুলেখার মনেরও পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। কবে কখন থেকে এর সূচনা তা সে নিজেই জানে না। মনে জ্বলছে এখন কামনার আগুন। ইউসুফ তার হৃদয়ে ছায়া ফেলেছে কামনা-বাসনার এক প্রেমিকপুরুষ হিসাবে।

জুলেখা প্রেমের উত্তাল নদীতে হাবুডুবু খায়। তার মনেই হয় না সে এক সম্ভ্রান্ত এবং সমাজের উঁচু মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্বের ঘরণী। যে পথে পা বাড়াবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে, সে বুঝতে চায় না এ পথ পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা, সামাজিক ন্যায়নীতি বিবর্জিত।

প্রেম মানে না কোনো বাধা— কোনো নির্দিষ্ট সীমানা। জুলেখা বেচয়ন হয়ে পড়ে। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, সামাজিক সীমানা পেরিয়ে মুক্ত বিহংগের মতো ইউসুফকে নিয়ে ডানা মেলতে চায়। হারিয়ে যেতে চায়। সারাক্ষণ সে ইউসুফকে নিয়েই ভাবে। শয়নে-জাগরণে, কাজে-কর্মে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউসুফের উপস্থিতি অনুভব করে। অথচ পরিণতি যে নিশ্চিত পদস্খলন তা সে ভাববার অবসর পায় না। তার একমাত্র চিন্তা, কেমন করে সে মাশুককে পাবে। কেমন করে বোঝাবে মনের অব্যক্ত দহন। মনে ঝড় বইছে। প্রলয়ংকরী ঝড়ের প্রবল ঝাপটা কি কখনো ইউসুফের মনে আলোড়ন তুলবে না?

কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান সব সময়ই নিজের কাজে অত্যন্ত তৎপর। এখানেও সে সক্রিয়। মানুষের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তার সামান্যতম গাফিলতি নেই। জুলেখার মনের তপ্ত আগুন উসকে দিয়ে ইউসুফকে কলংকিত করতে চায় শয়তান। নারী ছলনাময়ী। তার ছলনার অন্ত নেই। এবার ইউসুফ নিশ্চয়ই ফাঁদে পড়বে। এ নারীর হাত থেকে তাঁর মুক্তি নেই।

আজিজ ঘরণী নানাভাবে, নানাসাজে নিজেকে ইউসুফ আ. এর কাছে উপস্থিত করে। কারণে-অকারণে তাঁর সাহচর্য লাভের জন্য ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। ইশারা-ইংগিত, ছল-চাতুরী কোনো কিছুতেই সে তাঁর মনের নাগাল পায় না। হজরত

ইউসুফ আ. জুলেখার নোংরা প্রলোভনে সাড়া দেন না মোটেই। লালসালালিত রূপ, উচ্ছল যৌবনের তরংঘাঘাতে হজরত ইউসুফ আ. এর হৃদয় আন্দোলিত হয় না। বিক্ষুব্ধ ঝর্ণাধারা যেমন বার বার কঠিন শিলাখণ্ডে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে, অথচ পাষাণ শিলাখণ্ড থাকে স্থির, অচঞ্চল। ইউসুফের হৃদয় তেমনি পাষাণের মত স্থির। তিনি যে আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দা। আগামী দিনের নবী।

জুলেখার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কুবাসনা পূর্ণ হয় না। আত্মঅহমিকায় ঘা লাগে তার। নিজেকে ধিক্কার দেয় জুলেখা। একজন পুরুষকে যদি কাছে টানতে না পারে, তবে এ রূপ যৌবনের মূল্য কি? নারী জীবনের সার্থকতাই বা কোথায়? এ ব্যর্থতা তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। উদগ্র কামনার আগুন সহস্রগুণে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নারীর শয়তানী স্বরূপ এবার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে। এক অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনের জন্য জুলেখা তৈরী হয়ে যায়।

আজিজে মিশরের তরুণী বধু রূপ যৌবনের আকর্ষণে ইউসুফকে মোহাবিষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ে আরও বেপরোয়াভাবে মুখোমুখি হয়ে উঠে। তার কুবাসনা নিবৃত্তির প্রস্তাব দেয় সে নিজমুখেই। হে ইউসুফ, আমার এ রূপ যৌবনের লাবণ্যে বিকশিত দেহমন তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত। তুমি আমার ধ্যান-ধারণা-স্বপ্নের পুরুষ। আমার ভালোবাসার ধন। তোমার সবল, সুঠাম দেহের আবেষ্টনীতে আমাকে একাকার হতে দাও। মনের আগুন নিবৃত্ত করো। আমাকে নিঃশেষ হতে দাও, বিলীন হতে দাও। আমি যে জ্বলছি অহনীশ। যদি বুক চিরে দেখাতে পারতাম তবে দেখতে শুধু ইউসুফ ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে, জুলেখারও অস্তিত্ব নেই।

হজরত ইউসুফ আ. নির্বিকার। তিনি সাড়া দেন না। সাড়া দিতে পারেন না। আজিজ গৃহিণীর এ প্রস্তাব নিশ্চিত পতনের। এ অন্যায়। মহাপাপ! একজন পথপ্রাপ্ত মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করে দোজখের ইন্ধন হতে পারে না।

জুলেখার ইদানিং কালের কথা-বার্তা, চাল-চলন, ইশারা-ইংগিত হজরত ইউসুফ আ. এর দৃষ্টি এড়ায় না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতেও তাঁর কষ্ট হয় না। তবু তিনি না দেখার, না বোঝার ভান করেন। ঐ পথ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখেন। পাপ চিন্তা মনে রেখাপাত করতে পারে না। আজিজ গৃহিণী তাঁর মনিবপত্নী। আজিজ তাঁকে যথেষ্ট ইজ্জতের সাথে রেখেছেন। এ ইজ্জতের মূল্য তাঁকে দিতে হবে। পথভ্রষ্টরাই লোভ লালসার পংকে নিমজ্জিত হয়। মহাপ্রভুর নাফরমানী করে। তিনি নবীবংশের সন্তান। তাঁর রক্তস্রোতে নবুয়তী ধারা প্রবহমান। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে বিশ্ববিধাতা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ

করতে তিনি পারেন না। জুলেখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। কিছুতেই তাঁর দ্বারা এ জঘন্য পাপ সংঘটিত হতে পারে না।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আজিজ গৃহিণী। কেনা গোলামের এতো স্পর্ধা। কিসের এতো অহংকার? রূপের! রূপ তাঁর আছে বটে— কিন্তু বড়াই কেনো।

ইউসুফের এ ঔদ্ধত্য ধূলোয় গুড়িয়ে দিতে হবে। কেমন পুরুষ সে, যে একজন নারীর ভালোবাসাকে অবহেলা করে? হয় সে পুরুষ— নয় সে মহাপুরুষ।

জুলেখা চরম সিদ্ধান্ত নেয়। নারীত্বের অপমান সে সহ্য করবে না কিছুতেই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রূপচর্চায় আরো মনোযোগী হয়ে উঠে জুলেখা। প্রসাধনীর প্রলেপ আর মানানসই পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠে। মাশুককে ঘায়েল করার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। মনের ভ্রমর তার গুনগুনিয়ে উঠে।

নির্জন গৃহ। বাড়ীর পুরুষেরা সকলে বাইরে। দাসদাসীরা কাজে ব্যস্ত। আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে জুলেখার মন। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

অন্দরের ডাক এলো। ইউসুফ অন্যান্য দিনের মতোই আজিজ গৃহিণীর ডাকে কর্তব্যের খাতিরে অন্দরে প্রবেশ করলেন। মনে তাঁর সন্দেহের ছিঁটে ফোটাও ছিল না।

জুলেখার খাস্ কামরা। কামনা-মদির উচ্ছল যৌবনা তরুণী জুলেখা দুইবাহু মেলে সৌম্য দর্শন ইউসুফকে ভালোবাসার অমীয় সুধা পানের আহ্বান জানাচ্ছে। একি অপরূপ সাজে সেজেছে জুলেখা। চোখ তুলে তাকাতে পারেন না বিব্রত ইউসুফ। জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময়। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। এ অগ্নি পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

জুলেখা আকুতি জানায়— ইউসুফ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আশা অপূর্ণ রেখো না। নিষ্ঠুর হয়ো না। তুমি কি আমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাও না? আমার আমিত্ব বলে কিছু নেই। আমার সমস্ত সত্তাজুড়ে শুধু তুমি আর তুমি।

হজরত ইউসুফ আ. দৃঢ় প্রত্যয়ের এক পাষাণ প্রাচীর। জুলেখাকে তিনি প্রত্যাখান করলেন। —এ হতে পারে না। এ জঘন্য পাপ। তোমরা ছলনাময়ী

নারী। তোমাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। তোমার স্বামী আমার মনিব। আমাকে যথেষ্ট ইজ্জতের সাথে রেখেছেন তিনি। তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করবো? অসম্ভব! আমার সৃষ্টিকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী। তিনি সর্বজ্ঞ। পবিত্র তিনি। তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও তিনি পবিত্রতা দেখতে চান। সুতরাং সেই পবিত্র সত্তাই আমার পবিত্রতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট। তোমার নোংরা ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার জন্য আমি একমাত্র তাঁরই সাহায্যপ্রার্থী।

হজরত ইউসুফ আ. রক্ত মাংসের গড়া মানুষ। মানবিক চাহিদা থাকা অস্বাভবিক কিছু নয়। জুলেখার কামনার বহ্নি থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কোনো বাড়ন্ত যুবকের পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। বরং তার আহ্বানে সাড়া দেওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু হজরত ইউসুফ আ. আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা। আল্লাহ্‌র নবী। অন্যান্য নবীদের মতো তিনিও নিস্পাপ, নিষ্কলুষ। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সেই মহান আল্লাহ্‌ই তাঁকে রক্ষা করেছেন। পবিত্র রেখেছেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সর্বাবস্থায় হেফাজত করে থাকেন। যারা নিষ্ঠাবান তাদের হেফাজতকারী মহান আল্লাহ্‌। কোনো শয়তানী প্রলোভন পথপ্রাপ্তদের ক্ষতি করতে পারে না।

শয়তানের অসওয়াসা হয়তো হজরত ইউসুফ আ.কে কাবু করে ফেলতো। বিপদের বন্ধু, পরম প্রভুর প্রকাশ্য সহযোগিতাই তাঁকে রক্ষা করেছে। তিনি তাঁকে মোহমুক্ত করার জন্য নিদর্শন হাজির করেছেন। জ্বলন্ত অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করেছেন।

প্রেমে উন্মাদিনী নারীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন ইউসুফ। জুলেখার কুবাসনা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। জুলেখা পেছন থেকে ইউসুফের জামাটি টেনে ধরে নিজের দিকে টানতে থাকে। আর ইউসুফ নিজেকে মুক্ত করার জন্য সামনের দিকে এগুতে থাকেন। এভাবে টানাটানিতে তাঁর জামাটি পেছন থেকে ছিঁড়ে যায়। নারীর কবলমুক্ত হয়ে দ্রুততার সাথে দরজার আগল খুলে ফেলেন ইউসুফ। দরোজা খুলতেই দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আজিজে মিশর স্বয়ং। ইউসুফ থমকে দাঁড়ান। তার ঠিক পিছনে থমকে দাঁড়ায় জুলেখাও। কিংকর্তব্যবিমূঢ় গৃহকর্তা। নিজ স্ত্রী এবং ইউসুফ— উভয়ের অবিন্যস্ত অবস্থা দেখে মনে তার সন্দেহ দানা বেঁধে উঠে। কি করবেন, স্থির করতে পারেন না আজিজ। হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

পরিবেশ তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্য মুহূর্তে রূপ পালটে ফেললো জুলেখা। স্বামীকে লক্ষ্য করে বললো— এই সেই লোক, যাকে তুমি গোলাম হিসাবে খরিদ করে স্নেহের আধিক্যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় উন্নীত করেছো। সে আজ

তোমারই সম্ভ্রম হননের অভিলাষী। আমার উপর হামলা করতে উদ্যত হয়েছিলো ইউসুফ। যে লোক অন্নদাতা গৃহকর্তার মান মর্যাদার মূল্য দেয় না— এমন জঘন্য প্রবৃত্তির লোককে কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত। অথবা তাকে কারাগারে রাখাই উত্তম।

হজরত ইউসুফ আ. নারী চরিত্রের পরিবর্তনমুখী অবস্থা লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। জুলেখার কথার প্রতিবাদ করে বললেন— আমি কখনই আমার লালনকর্তার মান-সম্মান লুণ্ঠনে অভিলাষী নই বরং আপনার স্ত্রীই আমাকে তার কুবাসনা চরিতার্থের জন্য প্ররোচিত করেছিলো। আমি রাজি হইনি। টানাটানি করে সে আমার জামাই ছিঁড়ে ফেলেছে।

উভয়েই পরস্পরের উপর দোষ চাপাতে চাইছে। পরিস্থিতি বলছে দু'জনের যে কোনো একজন দোষী। কিন্তু কে সে? আজিজে মিশর বিষম খেলেন। তিনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না। তার সাথে আরও একজন উপস্থিত ছিলেন। তিনি জুলেখারই জ্ঞাতি। তিনি এতক্ষণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি সত্য কথাই বললেন। তিনি গৃহকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন— আপনি দেখুন, ইউসুফের জামাটি পেছন দিক থেকে ছেঁড়া । এ থেকে প্রমাণ হয় আপনার স্ত্রীই দোষী। যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকতো তবে ইউসুফকেই আমরা দোষী বলতে পারতাম। আজিজের কাছেও সব পরিষ্কার হয়ে গেলো এবং তিনি বড়ো রকমের ধাক্কা খেলেন। নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। মনে মনে উত্তেজিত হলেও নিজের মান-ইজ্জত, বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত রাখলেন তিনি। ইউসুফকে বললেন— আমার সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে তুমি সব কিছু ভুলে যাও। স্ত্রীকে বললেন— তোমরা ছলনাময়ী নারী। ছলনায় তোমরা বহুরূপী। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সব কিছু করতে পারো। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হও।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনাটি নিয়ে আজিজে মিশর ঘাটাঘাটি করতে চাননি। ইউসুফের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত— তাঁর কোনো চারিত্রিক দুর্বলতা নেই। ব্যাপারটা তার স্ত্রীর মধ্যে একতরফাভাবে সীমাবদ্ধ। তিনি চাইছিলেন এখানেই এর ইতি হোক। সমাজে সে যেন সমালোচনার বস্তুতে পরিণত না হয়।

কিন্তু ছাই দিয়ে কি কখনো আগুনকে ঢেকে রাখা যায়? জুলেখার অন্তরে কামনার যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, মাশুক বিনে তা নিভবে না। আজিজে মিশর চাইছিলেন তার স্ত্রীর হৃদয়ে যে অশান্ত ঢেউ উঠেছে তা প্রাথমিক বাঁধাতেই মিলিয়ে যাক।

কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না। জুলেখার মনের গাঙ্গে বান ডেকেছে। যৌবনের পালে লেগেছে মাতাল বাতাস। সে তো থামবে না। যতো বাঁধাই আসুক ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে তার ভালোবাসার নৌকা। সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলো। কারণ সে যে সন্দেহের উর্ধ্বে নয় তা সে ভালোই জানে।

লোক জানাজানি হয়ে গেলো, আজিজ গৃহিণী কুলটা । গোলামের সাথে প্রেম করে।

কুকাজে শয়তান অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। সে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে রঙ্গে-ঢঙ্গে কানে কানে চারদিকে ছড়িয়ে দিলো কথাটা। মিশরীয় রমণীরা বলাবলি করে— আজিজ গৃহিণী কেনা গোলামের সাথে ফষ্টি নষ্টি করে। কী লজ্জা। কী লজ্জা। আমরা হলে তো মরেই যেতাম। মহিলা মান-ইজ্জতের মাথা খেয়েছে।

কানাঘুষা কানে কানে জুলেখার কানেও ফিরে আসে। কিন্তু জুলেখার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রেম মানে না কোনো সীমারেখা-মান ইজ্জত, বংশ মর্যাদা। এই প্রেমের জন্যই তো যুগে যুগে, দেশে দেশে কতো নারী-পুরুষের ঘর ভেঙ্গেছে, কুল ছেড়েছে। কতো লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সয়েছে— কতো জীবন অকালে ঝরে গেছে। জ্বলেছে কতো নগর জনপদ। কতো রাজা-রাণীর স্বর্ণ-সিংহাসন ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়েছে। তবুও প্রেমের সর্বনাশা ধারা বয়ে চলেছে চিরকাল।

হজরত ইউসুফ আ. এর অতুলনীয় সৌন্দর্য, সুঠাম স্বাস্থ্য এবং উন্নত ব্যক্তিত্ব জুলেখার মনে সৃষ্টি করেছে অশান্ত তুফান। তার নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ইউসুফ ব্যতীত আর কিছু নেই। তার জীবন মরণ ইউসুফের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। লোক নিন্দার ভয় সে আর করে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মেয়েরা সাধারণতঃ সংকীর্ণমনা এবং পরশ্রীকাতর হয়ে থাকে। কানে কানে কথা ছড়ানোর কাজে তারা অত্যন্ত পারদর্শী। কোনো মুখরোচক ঘটনা তাদের সুললিত রসনায় পরিতৃপ্তি সহকারে পরিবেশিত হয়। জুলেখার ঘটনাও মিশর বাসিনীদের কানে কানে গুঞ্জরণ ছড়ায়।

জুলেখা ভাবে অন্য কথা। পরের দুর্বলতা নিয়ে যারা ঘাটাঘাটি করে— ঐসব মহিলাদের জব্দ করতে হবে। উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তারা যাতে বড়াই করে কথা বলতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার বিশ্বাস, ওরা যে গোলামের নিন্দা করছে সে গোলামকে দেখলে জীবন বাজী রেখে গোলামের গোলামী করতে চাইবে। সে ব্যবস্থাই জুলেখাকে করতে হবে।

একদিন জুলেখার খাসমহল ঝলমলিয়ে উঠলো। মিশরের সুন্দরী, ধনাঢ্য মহিলারা প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ে এলো। নানা সাজে সজ্জিত তারা। আজিজ গৃহিণীর অন্দর মহলের অতিথি আজ সবাই। জুলেখা তাদের দাওয়াত করে এনেছে। যেন তেন হলে কি চলে? নিজেদের রূপ যৌবনের জৌলুস দেখানোর এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে? সবচেয়ে দামী পোশাক আর মনোরম কারুকার্য খচিত স্বর্ণালংকারে ভূষিত করেছে নিজেদের। দামী প্রসাধনীর সুবাসে ভারী হয়ে যায় বাতাস। যেন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে মিশরিনীরা।

সুন্দরীদের পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর শুরু হলো গল্প গুজব। তাদের কথা যেন ফুরোয় না। মন উজাড় করে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত তারা। মুখরিত হয়ে উঠে জুলেখার অন্দর মহল। এরকম বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য তারা আজিজ গৃহিণীকে মোবারকবাদ জানায়। এতো কিছু ঘটনার পর কেনো এই আয়োজন তা তারা জানে না। এমন প্রশ্নও তাদের মনে উদয় হয়নি। জুলেখার মনের খবর তারা জানে না।

শুরু হলো আপ্যায়নের পালা। জুলেখা এই সময়টুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলো। লম্বা টেবিলের সামনে সকলে এক লাইনে বসে পড়লো। সবার সামনে প্লেটে আপেল এবং ছুরি দেয়া হয়েছে। আনন্দঘন পরিবেশে সবাই আপেল কেটে খেতে শুরু করলো। এই মূহূর্তটুকুর জন্যই জুলেখার এতো আয়োজন। অনেক চিন্তা –ভাবনা এবং পরিকল্পনা করেই সে এই সময়টুকু নির্ধারণ করেছে নিন্দুক মহিলাদের জব্দ করার জন্য। কাজেই কালক্ষেপণ না করে একঝাক সুন্দরীর সামনে হঠাৎ ইউসুফকে হাজির করলো জুলেখা।

কি আশ্চর্য! একসংগে সকলের দৃষ্টি হজরত ইউসুফ আ. এর প্রতি নিপতিত হলো। কি বিস্ময়! মুখরা রমণীকুল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। প্রকৃতি যেন ক্ষণেকের জন্য থেমে গেছে।

পরচর্চাকারী রমণীগণের এরকম অবস্থা দেখে জুলেখার মন আনন্দে নেচে উঠলো। গর্বে বুক ফুলে উঠলো তার। সবাইকে লক্ষ্য করে বললো— কি হলো তোমাদের। সবাই চমকে উঠে। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। একসাথে বলে উঠলো— এ মানুষ নয়! এ যে ফেরেশতা-নূরের পুতুল! মানুষ এতো খুবসুরত কখনো হয়! ফল কাটতে গিয়ে তারা সবাই নিজেদের আঙুল কেটে রক্তাক্ত করে ফেললো। প্রথম দৃষ্টিতেই তারা ইউসুফের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লো। তাঁর সহানুভূতি লাভের জন্য তারা নানা রকম ছলা-কলার আশ্রয় নিলো। জুলেখার ধারণাই সত্য প্রমাণিত হলো শেষ পর্যন্ত।

হজরত ইউসুফ আ. এক দংগল বুভুক্ষ রূপসী রমণীদের সামনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মনে মনে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করলেন তিনি— হে করুণাময়! চক্রান্তকারীদের কবল হতে তুমি যদি উদ্ধার না করো তবে আমি হয়তো ওদের খপ্পরে পড়ে অধপতিত হব। তিনি এই শয়তানী আড্ডা থেকে নিজেকে মুক্ত করার উপায় চিন্তা করতে থাকেন। গৃহকর্তার অনুমতির অপেক্ষায় অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে দোজখ যন্ত্রণার মতো মনে হতে লাগলো।

জুলেখা কর্তিতআংগুল সুন্দরীদের উদ্দেশ্যে বললো— যাকে কেন্দ্র করে তোমরা আমার সম্পর্কে কটুক্তি করেছিলে, এই সেই গোলাম। প্রথম দর্শনেই তোমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছো। তাঁর রূপে মোহিত হয়ে ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের আঙুলই রক্তাক্ত করেছো। আর আমি কতোদিন থেকে তাঁকে দেখছি। তাঁকে লালন করছি। প্রতিক্ষণে তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের স্পন্দন হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি— শিহরিত হচ্ছি। এবার তোমরাই বলো আমার অপরাধ কতটুকু?

একবাক্যে সবাই স্বীকার করলো, জুলেখার কোনো অপরাধ নেই। এমন অতুলনীয় রূপ যৌবনের ঝলকানী নারী মনকে ঝলসিত করবেই। আজিজে মিশরের অন্দরমহলে মিশরের সুন্দরী রমণীরা হজরত ইউসুফ আ. কে আকৃষ্ট করার জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করলো। নিজেদের দুর্বলতার কথা, প্রেমাসক্তির কথা বোঝাতে চাইলো। তারা জুলেখার মনের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্যও বারবার উপদেশ দিলো। তারা বললো— অন্নদাত্রী গৃহকর্ত্রীর প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করা উচিত নয়। মানুষ যা চেষ্টা করেও পায় না তুমি তা না চাইতেই পাচ্ছো। এ সুযোগ তোমার নষ্ট করা বোকামীই হবে।

কিন্তু হজরত ইউসুফ আ. পাথরের মতোই নিশ্চল। তিনি সেই মহাপ্রভুর আশ্রয়েই নিজের পবিত্রতা নিবেদন করলেন।

জুলেখা নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে দেখতে পেলো নিমন্ত্রিত মহিলাদের। সে গর্বিতা। নিন্দুকদের মুখে চুন-কালি পড়েছে। সকলকে শুনিয়েই সে বললো— আমার কথা ওকে শুনতে হবে। রূপের অহংকার নারীদেরই মানায়। পুরুষকে নয়। বোকা পুরুষেরাই রূপের গর্ব করে। আমার কথা না শুনলে ওকে জেলখানায় বন্দী করা হবে। তখন ওর সুন্দর দেহখানা আহত পাখির মতো বদ্ধ খাঁচায় ছটফট করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু ইউসুফ তো কারাগারকে ভয় পান না। তিনি তো দুনিয়াটাকেই একটা বন্দীখানা হিসাবে দেখেন। বন্দীখানা আর আকাশ ঘেরা পৃথিবী দুটোই তাঁর কাছে সমান। কুলটাদের ষড়যন্ত্র জালে পা দেওয়ার চেয়ে জেলখানাই তাঁর জন্য উত্তম। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়বন্ধুর আর্জি কবুল করলেন। তিনি ইউসুফের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই নোংরা পরিবেশ থেকে কারাগারের পথই সুগম করে দিলেন। হজরত ইউসুফ আ. এর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে আজিজে মিশরের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি এও বিশ্বাস করেন— ইউসুফের দিক থেকে বিশ্বাস ভংগের আশংকাও নেই। এ কারণেই তাঁকে স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। যতো ভয় স্ত্রীকে নিয়েই। সামাজিক অবস্থান এবং মান মর্যাদার কথা ভেবেই তিনি ইউসুফকে স্ত্রীর নাগালের বাইরে সরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সেই নিরাপদ আড়ালটা কোথায়? কারাগার! সেতো অসামাজিক দাগী অপরাধীদের ঠিকানা। সেখানে একজন ন্যায়নিষ্ঠ নিরাপরাধ লোককে কি করে রাখা যায়? বিবেক বাধা দেয়। তবু উপায় নেই।

অনেক ভেবে চিন্তে আজিজে মিশর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আল্লাহ্র এক প্রিয় বান্দাকে সাময়িকভাবে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। আর জুলেখা! সেও কি চেয়েছিলো ইউসুফকে সত্যি সত্যি কারাগারে পাঠানো হোক। এটা তার মনের কথা ছিলো না। ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করতে চেয়েছিলো। কারারুদ্ধ ইউসুফ নির্বিকার। ভাবলেশহীন। নির্ভয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। বন্দী জীবন। এখানে মুক্ত বাতাস নেই। চার দেয়ালের প্রকোষ্ঠে সীমাবদ্ধ পৃথিবী। তবুও ভালো— বাইরের দুনিয়ার পুঁতিগন্ধময় দূষিত আবহাওয়া থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে এ মুহূর্তে কারাগারই উত্তম। জুলেখার কামনামদির নোংরা আহ্বান আর শহরের রমণীদের উলঙ্গ প্রলোভন কারাগারের পাষাণ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তাঁকে আর উত্যক্ত করতে আসবে না। এ মুহূর্তে তাঁর জন্য কয়েদখানাই নিরাপদ আশ্রয়। ভালো-মন্দের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ই।

নিরিবিলি পরিবেশ। পরাণপ্রভুর প্রতি মনোযোগী হবার এইতো সময়। যে চিরঞ্জীব সত্তা তাঁকে অন্ধকূপে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আশার বাণী শুনিয়েছেন। মৃত্যু বিভীষিকা থেকে উদ্ধার করেছেন। অনিশ্চয়তার পঙ্কে নিমজ্জমান অবস্থায় পথ প্রদর্শন করেছেন। অন্ধকারে পথ দেখিয়েছেন। বার বার দিয়েছেন আলোর দিশা। সে অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা মানুষের কতটুকুই বা আছে? নিজের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই হজরত ইউসুফ আ. নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করলেন সেই পরম প্রভু, বিপদের কাণ্ডারী দয়ালু দাতা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। একমাত্র পরম সত্তার আরাধনায় কাটে তাঁর সমস্ত সময়।

বস্তুতঃ কারাগারেই হজরত ইউসুফ আ. জীবনের চরম উৎকর্ষ লাভ করেন। পরবর্তী কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা হয় এখান থেকেই।

সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। ফুলের প্রতি মধু মক্ষিকার আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। তেমনি মানুষও ফুলের মতো নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে আপনাআপনি। কেবল ক্ষেত্র বিশেষে তার রূপ বদলায়। কেউ পায় নৈসর্গিক সুখ, কেউ দোজখাগ্নির মর্ম যাতনায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়।

পবিত্রতায় এবং সৌন্দর্যে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম জগতে তুলনাহীন। স্বভাবতই কয়েদীরা তাঁর প্রতি কৌতুহলী হয়ে ওঠে। এ কি মানুষ। দক্ষ কুমোরের হাতে গড়া সোনার পুতুল যেনো। কোথাও খুঁত নেই। মানুষ এতো সুন্দর হয়। মহানবী হজরত মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন— মিরাজ রজনীতে সপ্তাকাশ ভ্রমণকালে আমি হজরত ইউসুফ আ.কে দেখেছি। আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টির অর্ধেক সৌন্দর্য তাঁকে দান করেছেন। বাকী অর্ধেক পেয়েছে অবশিষ্ট সৃষ্টিকুল। কাজেই ইউসুফের রূপের বর্ণনা সাধ্যাতীত।

সবাই জানলো, আজিজপত্নী জুলেখাকে অসৎকাজে ফুসলানোর অপরাধে ইউসুফকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। হজরত ইউসুফ কিন্তু নির্বিকার। আল্লাহ্পাক যেভাবে রাখেন সেভাবেই সন্তুষ্ট তিনি। কারাগারের নিরিবিলি পরিবেশ এবং প্রচুর সময় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সুযোগ এনে দিলো আল্লাহ্কে একনিষ্ঠভাবে স্মরণ করবার। অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন তিনি সৃষ্টিকর্তার আরাধনায়। মাঝে মাঝে কয়েদী এবং কারারক্ষীদের মধ্যে সত্য দ্বীনের প্রচার করেন। ভ্রান্তির বেড়াজালে আচ্ছন্ন মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোই তো তাঁর মহান ব্রত। এ ব্রত তাদের বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবহমান। পিতা হজরত ইয়াকুব আ., হজরত ইসহাক আ. এবং হজরত ইব্রাহিম আ. দ্বীন প্রচারের জন্যই মনোনীত হয়েছিলেন। জ্ঞানান্ধ মানুষের ইহ-পরকালীন কল্যাণকামনায় জীবনপাত করেছেন। সুতরাং ঐতিহ্যগতভাবেই হজরত ইউসুফ আ. এ দায়িত্ব পালনে উদগ্রীব ছিলেন। একজন মহান ব্যক্তিত্বের কাছে কারাগার আর রাজমহল একই সমান। হেদায়েতের বাণী প্রচারের জন্য তাঁরা সবখানেই সক্রিয়।

কারাগারের লোকজনদের কাছে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একজন মহামানব হিসাবে বিবেচিত হলেন। তাঁর নবীসুলভ আচরণ, অপরিসীম ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, চরিত্র মাধুর্য, জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা সকলকে মুগ্ধ করে। সবাই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে— ভালোবাসে। কারারক্ষীরাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো।

এরই মাঝে চলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি। আল্লাহ্তায়ালা পূর্ণরূপে দ্বীন প্রচারের যে দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পণ করবেন তার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ প্রস্তুতি চলে ধাপে ধাপে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত বান্দাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান করেন। ধীরে ধীরে ঘাত প্রতিঘাত আর প্রতিকূল ঘটনার মাধ্যমে তাঁদেরকে স্থিতধী করে তোলেন। হজরত ইউসুফ আ. এর শিশুকাল থেকেই এ শিক্ষার শুরু। বিজ্ঞ পিতার স্নেহধন্য সন্তান। পিতার কাছেই হাতে খড়ি। বাল্যাবস্থায় পিতার স্নেহবঞ্চিত হয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর মনোনীত বান্দাকে সহনশীলতা, ধৈর্যাবলম্বন, বিপদে আপদে এক আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকা, তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া, ইত্যকার নানান গুণে গুণান্বিত করে তোলেন। আর বিশেষভাবে দান করেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিষয়ক জ্ঞান। কারাভ্যন্তরে এলো পূর্ণতা। কারাগারের লোকজনের কাছে তিনি হলেন সম্মানিত। কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে সমাধানের জন্য তারা হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্মরণাপন্ন হয়।

দীর্ঘ সময় কেটে গেলো এভাবেই।

একদিন দু'জন লোক হজরত ইউসুফ আ. এর স্মরণাপন্ন হলো। এ দুজন কয়েদীও হজরত ইউসুফ আ. এর সমসাময়িক। তারা অত্যন্ত বিনয় সহকারে বললো— আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল এবং জ্ঞানীজন বলেই মনে করি। আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। প্রথম জন বললো— স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিংড়ে রস বের করছি। দ্বিতীয় জন বললো— আমি দেখলাম রুটির ঝাকা মাথায় করে হাঁটছি, আর পাখিরা রুটিগুলো ঠুকরে ঠুকরে যাচ্ছে।

প্রথম জন ছিলো বাদশাহ্‌র দরবারে মদ্য পরিবেশনকারী। সে আংগুর নিংড়ে রস থেকে মদ্য তৈরী করতো এবং রাজসভার দরবারীদের তা পরিবেশন করতো।

দ্বিতীয় জন পাকশালার তদারককারী। খাদ্যে এবং মদে বিষ মিশানোর অভিযোগে এ দুজনকে কারাগারে বন্দী করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত হচ্ছিল। ইতোমধ্যে তদন্ত শেষ হয়েছে। বিচারের রায় হবে হবে অবস্থা। এমনি সময় এক রাতে তারা দেখেছিলো স্বপ্ন দুটি।

হজরত ইউসুফ আ. সঙ্গীদের বললেন— তোমাদের জন্য পরবর্তী খাদ্য আসার পূর্বেই আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। প্রবল পরাক্রমশালী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক অনুগ্রহ করে এ জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনিভাবে অনুগ্রহ করেছিলেন আমার পিতা ইয়াকুব আ, পিতামহ ইসহাক আ. এবং প্রপিতামহ ইব্রাহিম আ.কে। তাঁরা যেমনিভাবে মানুষের মঙ্গলের জন্য সেই একক শক্তির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ছিলেন, তেমনিভাবে আমারও কর্তব্য তোমাদের কাছে সেই মহাশক্তির মহিমা প্রচার করা।

—তিনি আমাদের মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন। অথচ মানুষ কতো অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের শোকর গুজারী করে না। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তোমরা যে সব দেবদেবী আর ভূত-প্রেতের উপাসনা করো বাস্তবে তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। এগুলো তোমাদের বাপ-দাদাদের দ্বারা প্রচলিত পথভ্রষ্টতা মাত্র। এইসব অস্তিত্বহীন অসংখ্য মাবুদের চেয়ে এক আল্লাহ্ কি শ্রেষ্ঠ নয়? আমি ঐসব মনগড়া সৃষ্টিকর্তাদের মানি না। যিনি সমস্ত শক্তির উপর প্রভাবশালী, শাসন ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁর আরাধনার জন্যই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ইহা সরল এবং সঠিক ধর্ম। তাই আমাদের সকলেরই উচিত দুই জাহানের বাদশাহ্ একমাত্র আল্লাহ্‌রই আরাধনা করা।

হজরত ইউসুফ আ. নবী বংশের সন্তান। নিজে সত্য নবী। হেদায়েতের পয়গাম মানব সমাজে পৌঁছে দেয়া নবুয়তী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাঁদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই তিনি প্রথমে উপস্থিত

কয়েদীদ্বয়কে সত্য সরল পথ অবলম্বনের দাওয়াত দিলেন। তারপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। —বললেন, বন্ধুরা, তোমাদের মধ্যে মদ্যপরিবেশনকারী মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে। রুটির বোঝা বহনকারীকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখিরা তার মগজ ঠুকরে খাবে। এই ফয়সালাই তোমাদের জন্য নির্ধারিত। কর্মানুযায়ী পরিণাম আল্লাহ্‌র তরফ থেকে চূড়ান্ত হয়ে আছে। তিনি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করেন। অবাধ্যতার জন্য নির্ধারিত আছে কঠিন শাস্তি এবং আত্মসমর্পণকারীদের তিনি ক্ষমা করে দেন। অথচ অবোধরা সেই মহাবিচারকের কথা ভুলে যায়। তাঁর দেয়া নেয়ামত ভোগ করে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

মানুষ ভুল করে। এ ভুলে প্রধান ভূমিকা থাকে শয়তানের। মানব জাতির চরম শত্রু শয়তান। শয়তানই কলবের মধ্যে বসে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। কলবকে শয়তানমুক্ত করতে পারলেই মানুষের মুক্তি। মানুষ যদি নিজ ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় আল্লাহ্‌পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি বড় দয়াশীল। যাঁরা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা ভুল করলে তিনি ব্যথিত হন সবচেয়ে বেশী। সে কারণে তাদের মাসুলও দিতে হয় বেশী। তিনি চান তাঁর প্রতিনিধিত্বকারীরা সকল ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকুক।

হজরত ইউসুফ আ. ভুল করলেন। তিনি সদ্য কারামুক্ত লোকটিকে বললেন— তুমি তোমার মনিবকে আমার সম্পর্কে বলবে। আমি মিথ্যা অভিযোগে কারাভোগ করছি। লোকটি সততই হজরত ইউসুফ আ. এর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলো। প্রকৃত ঘটনা বাদশাহ্‌কে জানানোর সদিচ্ছাও ছিলো। কিন্তু শয়তান ছিলো তৎপর। সে লোকটিকে ভুলিয়ে দিলো।

মহান আল্লাহ্ তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য দুনিয়ায় প্রতিনিধি হিসাবে যেসব নবী রসূলদের পাঠান— সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা, বিপদ-আপদ থেকে তাঁদের রক্ষার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তাঁরাও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরশীল থাকেন। মাঝে মধ্যে তাঁরাও ভুল করে ফেলেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা তা করেন না। মানবীয় অনুভূতিই তাদের ভুল করিয়ে দেয়। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাঁরা অনুতপ্তও হন। কিন্তু আল্লাহ্ চান না তাঁর প্রিয়তম বান্দারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কোনো ভুল করুক। সদ্য কারামুক্ত লোকটিকে হজরত ইউসুফ আ. বাদশাহ্‌কে তাঁর মুক্তির জন্য অনুরোধ করতে বলেননি। শুধু জানাতে বলেছিলেন নিরাপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি শাস্তি ভোগ করছেন। এই সামান্য ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই তাঁর কারামুক্তি আরও কয়েক বছর বিলম্বিত হয়ে গেলো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আর একটি স্বপ্ন।

স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং মিশর সম্রাট রাইয়ান। সম্রাট স্বপ্ন দেখলেন— সাতটি মোটা তাজা গাভীকে আস্ত গিলে ফেললো অন্য সাতটি হাড্ডিসার গাভী। সাতটি জীর্ণ-শীর্ণ গমের শীষ অপর সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গমের শীষকে হজম করে ফেললো। আজব খোয়াব! বাদশাহ্ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর মর্ম উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি। সভাসদদের ডেকে পাঠালেন। ব্যাখ্যা চাই। এ আজব স্বপ্নের সঠিক বিশ্লেষণ জানা প্রয়োজন। কিন্তু কেউই মর্ম উদ্ধার করতে পারলো না। সবাই বললো— এসব আজে বাজে খোয়াব। এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। স্বপ্ন সঠিক হলে তার ব্যাখ্যা উদ্ধার করা যেতো। বিজ্ঞ রাইয়ান সভাসদদের সাথে একমত হতে পারলেন না। এ স্বপ্নে নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাবীর উদ্ধার করতে না পেরে তাঁর পেরেশানী আরও বেড়ে গেলো।

বাদশাহ্‌র অস্থিরতার কারণ এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে শরাব পরিবেশনকারী করজোড়ে নিবেদন করলো— হুজুর, বেয়াদবী ক্ষমা করে যদি আমাকে কিছুক্ষণের অবকাশ দেন তবে আমি আপনার খোয়াবের সঠিক তাবীর এনে দিতে পারবো।

বাদশাহ্ বললেন, নিশ্চয়, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এনে দাও। কেনো জানি না আমি পেরেশানীর মধ্যে আছি।

বাদশাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি জেলখানায় হাজির হলো। হজরত ইউসুফ সমীপে বাদশাহ্‌র স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললো, আপনি বিজ্ঞজন। চরিত্র মাধুর্যে এবং সততায় পবিত্রতম। এ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলে দিন। আপনার উচ্চ মর্যাদা এবং প্রকৃত সম্মানের মানদণ্ড বাদশাহ্ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। আপনার মুক্তির পথ সুগম হবে।

হজরত ইউসুফ বললেন— মহান সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই সাহায্যপ্রার্থী আমি। মূর্খরাই কেবল তাঁর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়। সেই মহান প্রভুর অনুগ্রহেই আমি তোমার বাদশাহ্‌র স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেবো। শোনো, সাতটি মোটাতাজা গাভী এবং সাতটি সতেজ গমের শীষ এর অর্থ হলো— পর পর সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে দেশে। সাতটি কৃষকায় গাভী এবং শীর্ণ গমবীজ হলো পরবর্তী

সাত বছর একনাগাড়ে খরা এবং দুর্ভিক্ষ হবে। চারদিকে হাহাকার পড়ে যাবে। জনপদ বিরান হয়ে যাবে। তবে তোমরা যদি দুর্ভিক্ষের মরণ ছোবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাও তবে আপৎকালীন সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তার উপায়ও বলে দিচ্ছি। সৌভাগ্যের বছরগুলোতে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যত্নবান হতে হবে। উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে অতিরিক্ত ফসল শীষের মধ্যেই রেখে গুদামজাত করতে হবে। এ অবস্থায় রাখলে সহজে ফসল নষ্ট হবে না। দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রয়োজনানুসারে শীষ থেকে শস্য বের করে নিলেই চলবে। বীজ হিসাবে কিছু গম এবং তৈলবীজ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। দুর্ভিক্ষের পর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। তখন নতুন উদ্যমে জমি চাষ করে বীজ বপণ করবে। তখন প্রচুর গম এবং তৈলবীজ উৎপন্ন হবে। দেশে আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে।

এভাবে হজরত ইউসুফ আ. দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং পরিত্রাণের উপায় বাতলে দিলেন। তিনি যে কতো উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় তাঁর বলে দেয়া সমাধান থেকে অনুমান করা যায়। কেননা মানুষ তখনো জানতো না, শীষের মধ্যে বীজ রেখে দিলে তা সহজে নষ্ট হয় না।

শরাব পরিবেশনকারী লোকটি খুশী মনে বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির হলো এবং হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের তাবীর বিশদভাবে জানালো। সমস্ত জেনে বাদশাহ্ তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। খোয়াবের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা এবং সংকট নিবারণের এরকম সহজ উপায় জেনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দুশ্চিন্তা দূর হলো। হজরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে তিনি চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাদশাহ্‌কে বিমোহিত করলো। তিনি যে সাধারণ কয়েদী নন এ ব্যাপারেও বাদশাহ্ নিশ্চিত হলেন। তিনি বললেন— নিশ্চয় সে উচ্চ মর্যাদাশালী বুজর্গ ব্যক্তি।

—জ্বি হুজুর। লোকটি চরিত্রবান, সত্যবাদী, সদাচারী, ধৈর্যশীল এবং ধর্মভীরু। তবে আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী নয়। তিনি এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলেন।

একজন ধর্মভীরু বুজর্গ ব্যক্তি বন্দীখানায় তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে— নিশ্চয় এটা অন্যায়। তিনি শরাব পরিবেশনকারীকে নির্দেশ দিলেন—তুমি এখনি লোকটিকে মুক্ত করে দরবারে নিয়ে এসো।

হজরত ইউসুফ আ.কে দীর্ঘদিন ভুলে থাকার জন্য শরাব পরিবেশনকারী লোকটি নিজেকে ধিক্কার দিলো। বাদশাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে দ্রুতপায়ে জেলখানায়

উপস্থিত হয়ে হজরত ইউসুফ আ.কে বললো— জনাব, সুসংবাদ। আপনার মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি। স্বয়ং সম্রাট আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মুক্তির সংবাদ শুনে হজরত ইউসুফ আ. কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি স্থির অচঞ্চল। ধৈর্যের পরীক্ষায় তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনই ধৈর্য সহনশীলতার এক উল্লংঘ পর্বত। বাল্যাবস্থা না পেরুতেই সৎভাইদের চক্রান্তে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হলেন। সেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি নির্বিকার এবং এক আল্লাহ্‌র প্রতি অটল বিশ্বাসের এক মূর্ত প্রতীক। তারপর বণিকদের হাত ঘুরে পণ্য সামগ্রী হিসাবে এলেন এই মিশরে। স্নেহশীল পিতামাতা, সহোদর ভাই, মাতৃভূমির টান কোনো কিছুই তাঁকে ধৈর্যচ্যুত করতে পারেনি। কৃতদাস হয়ে আজিজগৃহে গমন, তার অঢেল অর্থ সম্পদ, আজিজ পত্নীর কামনা মদির আকর্ষণ, মিশরের সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী রমণীদের প্ররোচনা, জেলখানার মানসিক নির্যাতন এবং সবশেষে জেলমুক্তির সুসংবাদ কোনোটাই তাঁর মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। কি সুখে, কি দুঃখে সর্বাবস্থায় প্রবল পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই ইতিহাসে তিনি একটি সুন্দর ঘটনার প্রতীক হয়ে আছেন।

মহানবী হজরত মোহাম্মদ স. এরশাদ করেন— হজরত ইউসুফ আ. এর মতো দীর্ঘদিন কারাভোগের পর মুক্তির সংবাদ পেলে সাথে সাথেই আমি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতাম। এই উক্তির মধ্যে রসুলেপাক স. এর দুর্বলতা নয়, বরং হজরত ইউসুফ আ. এর ধৈর্য এবং সহনশীলতার প্রশংসাই করা হয়েছে।

নবী ইউসুফ আ. বাদশাহ্‌র তরফ থেকে মুক্তির সংবাদ পেয়েও তা সাদরে গ্রহণ করেননি। সংবাদ বাহক লোকটিকে তিনি বললেন— এভাবে আমি মুক্ত হতে পারি না।

হজরত ইউসুফ আ. পাহাড়ের মতো অটল। যে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বন্দীত্ব বরণ করতে হয়েছে, তার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এ মুক্তি বার্তা তাঁকে স্বস্তি দিতে পারবে না। তাই বাদশাহ্‌কে তিনি বলে পাঠালেন— তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত ষড়যন্ত্রের প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করতে হবে। যে সব মহিলারা নোংরা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, নিজেদের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আঙুল কেটেছিলো, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। সেই নোংরা ফাঁদে পা না দেয়ার কারণেই তাঁকে কারাভোগ করতে হয়েছে। প্রকৃত সত্য উদঘাটন না হলে চির জীবন দোষী হয়েই থাকতে হবে। এরকম মুক্তির মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই। তাছাড়া এতে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে।

হজরতের কথা শুনে লোকটি বিমোহিত হলো। সেই কবেকার কথা। এর মধ্যে কতো পানি গড়িয়ে গেছে। আজিজও আর নেই। অনেকে হয়তো ভুলেই গেছে ঘটনাটি। অথচ এতদিন পরে সেই ঘটনার ফয়সালা চাইছে ইউসুফ। এ লোক সাধারণ মানুষ নয়। বিমর্ষ বদনে সে ফিরে গেলো। সমস্ত ঘটনা সে বাদশাহ্‌কে খুলে বললো। বাদশাহ্‌ও বিস্মিত হলেন। তাঁর মনেও দৃঢ় ধারণা হলো— এ লোক কখনো অপরাধ করতে পারে না। তাঁর নিষ্কলুষতার প্রমাণের প্রয়োজনেই প্রকৃত তথ্য অনুন্ধান করা দরকার। ধৈর্যশীল, চরিত্রবান, জ্ঞানী এবং মৌখিক ও আধ্যাত্মিকতায় উচ্চস্তরের লোকদের পক্ষেই এমনি হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে হবে। কেননা এ মুহূর্তে তাঁকে বাদশাহ্‌র খুবই প্রয়োজন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নিজ কর্তব্যে নবী ইউসুফ আ. ছিলেন আজীবন নিষ্ঠাবান। আজিজে মিশর এবং আজিজ পত্নী জুলেখার প্রতি তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিলো অফুরন্ত। যে সংসারে তিনি সন্তানতুল্য লালিত পালিত হয়েছেন সে পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন হোক তা তিনি কখনো চাননি। ইউসুফের প্রতি স্ত্রী জুলেখার অসামাজিক প্রেমাসক্তির কারণে সুনাম নষ্ট হওয়ার ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আজিজ তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলে পাঠিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ করেই একদিন মৃত্যুবরণ করেন তিনি। বেঁচে থাকলে হয়তো নিরাপরাধ লোকটিকে জেলখানায় ফেলে রাখতেন না এতো দীর্ঘ সময়।

নবী ইউসুফ পিতৃতুল্য আজিজে মিশরের সম্মান রক্ষার্থে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য জুলেখাকে পর্দার অন্তরালে রেখেই বিষয়টির মীমাংসা চেয়েছিলেন। সেজন্য সেই সব মহিলাদের কথা বলেছেন যারা নিজেদের প্রতি ইউসুফের দৃষ্টি ফেরানোর প্রচেষ্টায় স্বইচ্ছায় হাতের আংগুল কেটেছিলো। নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেননি। উল্লেখ্য, জেলখানায় প্রেরণের ব্যাপারে শহরের রমণীগণের ভূমিকাও কম ছিলো না।

হজরত ইউসুফ আ. এর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কার্যকলাপ বিবেচনা করে বাদশাহ্ অত্যন্ত প্রীত হলেন। যথাসত্বর তিনি দরবারীদের ডেকে পাঠালেন। ঐ সব মহিলাদেরকেও দরবারে উপস্থিত করা হলো। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বাদশাহ্ বললেন— ইউসুফের ব্যাপারে তোমাদের মতামত জানতে চাই। তোমরা কি তাঁর কথা ভুলে গেছো? সে এখন কারাগারে।

যৌবনে মানুষের মনে লাগে রঙ। চোখে ধরে নেশা। চলন-বলন, পোশাক-আশাকে থাকে অকারণ উচ্ছলতা। যৌবনের অস্থির চঞ্চল, দুর্দমনীয় শক্তি মানুষকে সীমা লংঘন করতে উদ্বুদ্ধ করে। জোয়ার এলে নদীতে জাগে যৌবনের দূরন্ত জলোচ্ছ্বাস। দুই তীরের মাটির বন্ধনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। মানুষও যৌবনের দূর্বার জোয়ারের তোড়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় অসম্ভবের সকল তটচিহ্ন। স্বপ্ন দেখে। কল্পনায় ফানুস উড়ায়। সমাজিক বাঁধা বন্ধনকে ছিন্ন করে পদানত করতে চায় সবকিছু। এই দুর্দমনীয় শক্তির মোহে মানুষ ডেকে আনে নিজের ধ্বংস।

তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌবনেও ভাটা পড়ে একসময়। স্তিমিত হয়ে পড়ে প্রবৃত্তি চিন্তা। ভারসাম্য আসে। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ধরা পড়ে। অনুশোচনা জাগে। পেছনের ভুল ক্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টায় তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষেরা।

মিশরীয় রমণীগণ এবং জুলেখা যে সময়ে হজরত ইউসুফ আ. কে ফুসলিয়েছিলো, তখন তাদের পৃথিবী ছিলো স্বপ্নময়। কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিলো যৌবন। কামনা বাসনার উন্মাদনা ছিলো দেহের ভাঁজে ভাঁজে। হৃদয়ে ছিলো ভালোবাসার উত্তাল সমুদ্র। কিন্তু এখন তারা বিগত যৌবনা। উন্মাদনার বদলে এখন এসেছে স্থিরতা।

তারা সবাই একযোগে স্বীকার করলো— ইউসুফ পবিত্র। তাঁর রূপ-লাবণ্যের মোহে আমরাই বিভ্রান্ত হয়েছিলাম এবং নোংরা কাজে প্রবৃত্ত হবার জন্য প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু পাপ-পঙ্কিলপথে পা দেয়নি ইউসুফ।

জুলেখা ছিলো ইউসুফের প্রেমে উন্মাদিনী। পতঙ্গ যেমন প্রদীপের আগুনে ছাই হয়ে যায় তেমনি সেও মান-সম্মান, সামাজিকতার বাঁধা ডিঙ্গিয়ে ইউসুফের মাঝে বিলীন হতে চেয়েছিলো কিন্তু আজ যৌবনের সে জৌলুষ নেই। দেহে উত্তেজনা নেই। সময় এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেহে এবং মনে এসেছে পরিবর্তন। আকর্ষণ এখনো আছে। কিন্তু তা দেহে নয়, মনে। পার্থিব কামনা বাসনার সীমানা পেরিয়ে সে প্রেম আজ অপার্থিব জগতের স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীনা। তাই সে আজ নির্ভয়।

সভাসদগণের মাঝে জুলেখা তার মাশুকের পবিত্রতা ঘোষণা করলো। সে বললো— মানুষের নফস মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে। নফসের আকাংখা পূর্ণ হয়নি। সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহ্ মেহেরবান। ইউসুফের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি না এবং আমার স্বামীর আমানতও খোয়াইনি— এটাই আমার আত্মতৃপ্তি। আমার নোংরা বাসনা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে— ইউসুফ পবিত্র রয়েছে।

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু, বিজ্ঞানময়। তাঁর প্রিয় বান্দার পবিত্রতা, তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ থেকেই ঘোষণা করিয়ে নিলেন। তাঁর পবিত্রতার উপর মোহরাঙ্কিত করে দিলেন।

বিস্মিত হলো দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। চমৎকৃত হলেন মিশরাধিপতি। চক্রান্তকারীরা নিজেরাই আজ ইউসুফকে নির্দোষ বলে সাক্ষ্য দিয়েছে।

ধন্য ইউসুফ। ধন্য আল্লাহর প্রিয় পবিত্র নিষ্পাপ নবী হজরত ইউসুফ আ.। তাঁকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন বাদশাহ্ । সত্বর তাঁকে দরবারে হাজির করবার নির্দেশ দিয়ে কারাগারে লোক পাঠালেন তিনি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হজরত ইউসুফ আ. দরবারে উপস্থিত হলেন। দরবারীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন অনিন্দসুন্দর নবীর দিকে। সসম্মানে সম্রাট তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। তাঁর নূরানী চেহারা বাদশাহ্কে বিমোহিত করে তুললো। ক্ষণকালের জন্য নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। নির্বাক হলো সভাসদ ও প্রহরীগণ। সমস্ত দরবার কক্ষে বেহেশতি নিস্তব্ধতা। পৃথিবী যেন স্থির হয়ে আছে অভূতপূর্ব এক মৌনতার মধ্যে।

নীরবতা ভাঙলেন বাদশাহ্। আপনার হেকমত, বিচক্ষণতা অতুলনীয়। আমার দৃষ্টিতে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও মর্যাদাশালী। স্বপ্নের তাবীর বিজ্ঞানসম্মত। দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি কি হওয়া উচিত, বিস্তারিত জানতে চাই।

নবী ইউসুফ বললেন— আপনার ধন ভাণ্ডারের দায়িত্ব আমাকে দিন। রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আমি শুধু অভিজ্ঞ নই, বিশেষজ্ঞও বলতে পারেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হবো।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হজরত ইউসুফ আ.কে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ আগেই দিয়েছেন। আজিজে মিশরের সম্পদের হেফাজত করেছেন তিনি।

বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় সাফল্যের সাথেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ্ বিজ্ঞানময় কুশলী। তিনি এভাবেই তাঁর প্রিয়জনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে পৌঁছে দেন। তারপর খোদায়ী দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করেন।

হজরত ইউসুফ আ. এর প্রস্তাবে প্রীত হলেন বাদশাহ্। তিনি যেন এমনটিই চাচ্ছিলেন। এমন একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ, পুত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রাজ্যের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে সংকট মোকাবেলার কোন সমস্যাই থাকবে না। প্রস্তাব কবুল করলেন তিনি। নিজের হাতের রাজকীয় আংটি হজরত ইউসুফ আ. এর আংগুলে পরিয়ে দিলেন, সোনার চেনও পরিয়ে দিলেন গলায়। দরবারী এবং রাজকর্মচারীদের সামনে ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। সবার মাঝে ঘোষণা করে দিলেন— ইউসুফ আমার রাজ্যের অর্থনৈতিক অঙ্গনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর পরিকল্পনা মতো সবকিছু চলবে। তাঁর উপর কথা বলার কেউ থাকবে না। আইন তাঁরই কথা এবং কাজ। এ দিক থেকে আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত থাকবো। এ ঘোষণায় সভাসদ এবং রাজকর্মচারীদের মধ্যে সন্তুষ্টির আমেজ দেখা গেলো।

এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল। মহামহিমের কি আমোঘ বিধান। কেমন সুকৌশলে তিনি তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না।

কিছুক্ষণ আগেও তিনি ছিলেন একজন সাধারণ কয়েদী। মিশরের অধিকাংশ লোকই প্রায় ভুলে গিয়েছিলো ইউসুফ নামের আজিজ পরিবারের এক গৃহভৃত্যকে। সময়ের চক্রে তিনি এখন মিশরের ধনভাণ্ডারের কর্তা, বিধাতা। চমৎকার আল্লাহ্র বিধান। মুহূর্তে বাদশাহ্ হয় ফকির আর ফকির হয় বাদশাহ্।

তখনকার মিশর ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে উন্নত। বিজ্ঞানে তারা এতোই উন্নত ছিলো যে, মানুষকে অমরত্বে উন্নীত করার গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছিলো তারা। জীবন-মরণ তো আল্লাহ্র হাতে। মানুষ কখনো তাঁর ক্ষমতার ভাগীদার হতে পারে না। তবুও অমর জীবন অর্জনের গবেষণায় মেতে উঠেছিল মিশরীয়রা। মৃতদেহকে দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে ধরে রাখবার উপায় আবিষ্কারে সফল হয়েছিলো তারা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সূচনালগ্নেই সর্বময় ক্ষমতা পেয়ে প্রথমে আসন্ন দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন হজরত ইউসুফ। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তিনি সমগ্র মিশর রাজ্য ভ্রমণ শুরু করলেন। পল্লীতে পল্লীতে অতিরিক্ত বহুসংখ্যক খাদ্যগুদাম তৈরীর ব্যবস্থা করলেন। যথাসত্বর সম্ভব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবার নির্দেশ দিলেন। জমিতে কীভাবে অধিক ফসল ফলানো যায়, সে বিষয়ে কৃষকদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কীভাবে উৎপাদিত ফসল শীষের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে সে বিষয়েও পরামর্শ দিলেন। এ সব এলাকায় কাজ তদারকির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক রাজ কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। এভাবে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

প্রথমে এলো সৌভাগ্যের সাত বছর। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। জমি চাষ হলো। সোনালী ফসলে মাঠ ভরে গেলো। ফসলের এমন প্রাচুর্য মিশরবাসী কখনো দেখেনি। আনন্দে উৎফুল্ল হলো তারা। পরিকল্পনা মাফিক ফসল সংরক্ষণের কাজও এগিয়ে চললো। উৎপাদিত ফসল এলাকা ভিত্তিক সংরক্ষণ শুরু হলো। সংগৃহীত ফসলের জন্য কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দেয়া হলো। কৃষকরা নিজেরাও আপৎকালীন সময়ের জন্য সাধ্যানুসারে ফসল সংরক্ষণ করলো।

এভাবেই সৌভাগ্যের সাত বছর— সম্রাটের স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো। দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেলো সুখের দিন। দুর্ভিক্ষ হাতছানি দিতে শুরু করলো। এরপর শুরু হয়ে গেলো অনাবৃষ্টি, অজন্মা। চারদিকে খরার দাপট। উপরে মেঘশূন্য আকাশ। পায়ের তলার মাটি ফেটে চৌচির। ফলসশূন্য মাঠে দুরন্ত রোদের উথাল পাথাল ঢেউ। পাতা ঝরা বৃক্ষগুলো কংকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে শূন্যতা, বিষণ্নতা, হাহাকার। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা একাকার হয়ে গেছে। খরার দাবদাহে। বন-বননী জীর্ণ ভিখিরীর মতো এক ফোঁটা বৃষ্টির আশায় রোরুদ্যমান। দেশান্তরী হচ্ছে বন্য-প্রাণী। কোথায় আছে নিরাপদ আশ্রয়। কোথায় শান্তি। গৃহপালিত পশুরা ভীত-সন্ত্রস্ত। কেয়ামত শুরু হলো বুঝি।

দুর্ভিক্ষ আস্তে আস্তে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। নিষ্ঠুর প্রতীক্ষার দিন যেনো সহজে ফুরাতে চায় না। রাত তো আরো দীর্ঘ। পোহাতে চায় না।

প্রথম পর্যায়ে মানুষ নিজেদের সংগ্রহ থেকে খেতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে গেলো ভাণ্ডার। দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। খাদ্য নেই— খাদ্য চাই-বাঁচতে চাই। বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির হলো প্রজাবৃন্দ। অর্থ দাও— খাদ্য দাও। সম্রাট তাদের সান্ত্বনা দিলেন। খাদ্যের অভাবে তোমরা মরবে না। প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে। তোমরা ইউসুফের কাছে যাও। সেই তোমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করবে— বললেন বাদশাহ্‌। প্রকৃতপক্ষে মিশরের বাদশাহী তখন হজরত ইউসুফের হাতেই। সম্রাট, রাইয়ান নাম মাত্র সম্রাট। ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা ইউসুফের হাতে ন্যস্ত করে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছেন।

প্রজাবৃন্দ হজরত ইউসুফ আ. এর কাছে খাদ্যশস্যের জন্য ধর্ণা দিলো। তিনি সকলের কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্য নিয়ে খাদ্য বিতরণ শুরু করলেন।

খাদ্য বিতরণ চলে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা। মিশরবাসীর মধ্যে কিছুটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলেও আশে পাশের রাজ্যগুলোতেও এ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমশঃ তা প্রকট আকার ধারণ করলো। সেখানে তো কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেই। সংগ্রহশালাও নেই। সুতরাং খাদ্যের জন্য তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। খাদ্য নেই। পানীয়ের অভাব। চর্তুদিকে শুরু হলো নারী পুরুষের আহাজারী। শিশুর আর্তচিৎকারে আকাশ ভারী হয়ে উঠে। কিন্তু কোথায় খাদ্য। দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর থাবা বিশাল অনল শিখার মতো সুদূর কেনান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

কেনান— একে তো মরু এলাকা। খাদ্য শস্য সহজলভ্য নয়। তার উপর দুর্ভিক্ষের নগ্ন হামলায় মানুষ দিশেহারা। অসহায় মানুষ মৃত্যুর দিন গুণছে। সামনে অন্ধকার। হজরত ইয়াকুব আ এর সন্তানরা বাকহারা। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

হজরত ইয়াকুব আ. আল্লাহ্‌র নবী। তাঁকে জ্ঞান দান করেছেন আল্লাহ্‌ স্বয়ং। তিনি তো নিরাশ হতে পারেন না। তিনি তাঁর দশ ছেলেদের ডেকে বললেন— তোমরা অন্ধ, অজ্ঞ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর ভরসা নেই তোমাদের। শুনেছি মিশর সম্রাট দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের মধ্যে অর্থের বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিতরণ করছেন। তোমরা মিশর চলে যাও। অর্থের বিনিময়ে উট বোঝাই করে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

হজরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানরা ভাবলো— সত্যিতো, বৃদ্ধ পিতা অনেক কিছুরই খবর রাখেন। অথচ আমরা শক্ত সমর্থ দশজনের এই দল ফলপ্রসূ কোনো চিন্তাই করতে পারিনি। আর দেরী নয়। মিশর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবার।

শুরু হলো পথ চলা। সঙ্গে যোগ দিলো দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদের আরও অনেকে। বেশ বড়োসড়ো একটি কাফেলা প্রস্তুত হলো। গন্তব্য মিশর। উটের বাহনে মিশর যেতে সময় লাগে আট দিন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মিশরসম্রাটের অতিথিশালা। বিদেশী অভ্যাগতদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে এই মেহমানখানা। দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কেনানী দলটিকে এখানেই আশ্রয় দেয়া হলো। যথারীতি তাদের আপ্যায়ন করা হলো। বিশ্রামান্তে তারা রাজকর্মচারীদের কাছে মিশর আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। রাজকর্মচারীরা বিদেশীদের নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সন্দেহমুক্ত হয়ে তাদেরকে বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির করলো।

বিদেশীদের দেখে বাদশাহ্ চমকে উঠলেন। এ কী করে সম্ভব! তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন। যা কখনো ভাবেননি, সেই মুর্তিমান কাহিনী তাঁর সামনে। বুকটা তাঁর কেঁপে উঠলো। কতোদিন-কতো কথা, কতো ঘটনা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। বৈমাত্রেয় দশভাইকে চিনতে তাঁর মোটেও অসুবিধা হলো না। অন্ধকূপের সেই ভয়ঙ্কর সময়ের সুললিত ঐশী বাণী তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন তিনি।

বৃদ্ধ পিতা-মাতা, ছোট ভাই বিন ইয়ামিন এবং পরিবারের অন্যান্য সকলে কেমন আছে? দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনাহার ক্লিষ্ট পরিবার পরিজনের কথা কল্পনা করলেন তিনি। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ভাইদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কেমন আছে। কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নয়। জান-মাল-ইজ্জতের যিনি মালিক তাঁর ইচ্ছাতে সবকিছু ঘটে এবং ঘটবে। সুতরাং সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় ধৈর্যাবলম্বন করাই তাঁর জন্য উত্তম।

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। নানা কথার মাঝে পিতা-মাতা-পরিজনের খোঁজ খবর নিয়ে নিলেন হজরত। তাঁর মনে তখন ঝড় বইছে। কিন্তু সে ঝড় তিনি মনেই রেখে দিলেন বাইরে প্রকাশ হতে দিলেন না।

অতঃপর মূল্যের বিনিময়ে খাদ্য শস্য দিয়ে তাদের উটগুলো বোঝাই করে দেয়া হলো। পরিবার পরিজনের অভাবের কথা চিন্তা করে খাদ্য শস্যের মূল্য তিনি

রাখলেন না। এই অর্থ তাদের উপকারে আসবে। ভাইদের অগোচরে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্যের মাধ্যমে টাকাগুলো উটের হাওদার মধ্যে রেখে দিলেন। প্রয়োজনে এ অর্থ দিয়ে তারা আরও খাদ্য কিনতে পারবে।

তারা বললো— বৃদ্ধ পিতা বিন ইয়ামিনের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তার এক ভাই ছোট বেলা হারিয়ে গেছে। সে ছিলো পিতার স্নেহভাজন সন্তান। তাঁর শোকে পিতা অন্ধ হয়ে গেছেন। বিন ইয়ামিনকে অবলম্বন করেই স্নেহময় পিতা হারোনো সন্তানের দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করেন। তবে আমরা চেষ্টা করবো আমাদের বৈমাত্রেয় ভাইটিকে নিয়ে আসার জন্য। মনে হয় আমরা অবশ্য সফলকাম হবো। কেননা খাদ্যশস্য আমাদের বড়ই প্রয়োজন।

হজরত ইউসুফ আ. বললেন– হ্যাঁ। অবশ্যই তোমরা তাকে নিয়ে আসবে। বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশু ব্যতীত প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য আসতে হবে। কেউ যেনো অতিরিক্ত ফায়দা লুটতে না পারে সে জন্য বিতরণের ব্যাপারে আমরা কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলি। ন্যায্যভাবে বণ্টন করি এবং ওজনে কম দেই না। তাছাড়া অভ্যাগতদের আরাম আয়েশ এবং সেবা যত্নের দিকেও যথেষ্ট খেয়াল রাখি। দেশী-বিদেশী কারো ব্যাপারেই আমরা নিয়মের ব্যতিক্রম করি না। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা শেষ না হতেই খাদ্যশস্য ফুরিয়ে যাক এবং জনগণ না খেয়ে মরুক— তা আমরা চাই না।

ভাইয়েরা গদ গদ হয়ে বললো— জ্বি জাঁহাপনা, এ ব্যাপারে আমরা নিজেরাই প্রমাণ। বিদেশীদের আপ্যায়নের ব্যাপারে আপনি যথেষ্ট যত্নশীল। এবার আমাদের বিদায় দিন। আমরা শীঘ্র শীঘ্র ফিরে আসবো। আমাদেরকে খাদ্যের প্রয়োজনে আবার আসতেই হবে।

এসো। অনুমতি দিলেন শাহানশাহে মিশর। খাদ্য বোঝাই উটগুলো এগিয়ে চললো। হাজার শোকর আল্লাহ্‌র দরবারে— এ খাদ্যশস্য যাচ্ছে তাঁরই পরিজনদের জন্য। চলন্ত কাফেলার দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হজরত ইউসুফ। শুভ দিনের সূচনা হলো কি? যে দিনটির জন্য তিনি কতোকাল ধরে অপেক্ষায় রয়েছেন। পিতা-মাতা-ভাই-জ্ঞাতীদের সঙ্গে মহামিলনের ক্ষণ আর কতো দূরে?

হজরত ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের ঠিকই চিনেছেন। তাদের চলন-বলন, ভাব-ভঙ্গিমা কিছুই বদলায়নি। চেহারায় পরিবর্তন এসেছে বয়স বাড়ার কারণে। ভাইদের সেই পৈচাশিক আচরণ, নিষ্ঠুর ব্যবহার বার বার মনে করিয়ে দেয় তাদের নির্দয় মুখচ্ছবি।

কিন্তু ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি। চেনার কথাও নয়। সেই ছোট্টটি যখন ছিলেন— তখনকার চেহারা, স্বাস্থ্য, কণ্টস্বর, আচার আচরণের অনেক পরিবর্তন এসেছে। ইউসুফকে হয়তো তারা ভুলেই গেছে। তারা ভুলে গেছে মহান আল্লাহ্‌র অপার মহিমার কথা। তিনি কাংগালকে করেন বিত্তশালী, ধনগর্বে গর্বিতকে করেন ভিখারী। ক্রীতদাসকে দান করেন বাদশাহী এবং বাদশাহ্‌কে বানান মিসকীন। ভাঙাগড়ার এ খেলা চলে চিরকাল। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌ তাঁর অনুগতদের বেছে নেন।

হজরত ইউসুফ ছিলেন মরুচারী বেদুঈন সন্তান। মেষ চরানো ছিলো তাঁদের পারিবারিক সাংসারিক পেশা। কিন্তু নবুয়তী বৈশিষ্ট্য এ পরিবারকে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে সম্পদশালী করেছে। দৈন্য তাঁদের নিত্য দিনের সহচর। কিন্তু সেই বিশ্ব নিয়ন্তার কারিগরী কৌশল বোঝা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। তিনি হজরত ইউসুফকে দুনিয়ার এবং আখেরাতের বাদশাহী দান করলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। প্রথমে আজিজের গৃহে তাঁর অর্থ সম্পদ জমিদারীর খবরদারী করার অধিকার দান করলেন। তারপর বানালেন মিশর দেশের একমাত্র হুকুমদাতা। যে মিশরীয়রা বেদুঈনদের ঘৃণা করতো সেই তারাই আজ এক বেদুঈন সন্তানকে রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বসিয়ে কুর্ণিশ করছে শতবার। অথচ মানুষ এ সব ব্যাপারে মোটেই চিন্তা ভাবনা করে না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

খাদ্য বোঝাই উটের কাফেলাটি কেনান এসে পৌঁছলো। পিতার সাথে কুশল বিনিময়ের পর তারা খাদ্যের বস্তাগুলো নামাতে শুরু করলো। তারা পিতাকে বললো— আব্বাজান, শুনে অবাক হবেন—মহানুভব মিশরের বাদশাহ্‌ আচার ব্যবহারে, আতিথেয়তায় তুলনাহীন। আমাদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিলো আপনজনের মতোই। হজরত ইয়াকুব আ. ছেলেদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন।

—তবে আব্বাজান, দুর্ভিক্ষের যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আমাদের আবারও সেখানে যেতে হবে। এবার পিতা যেনো ছেলেদের কথাবার্তার মধ্যে কিসের গন্ধ পেলেন। কিছু বলতে চায় তারা। তিনি বললেন, বলো, কি বলতে চাও।

ছেলেরা বললো— পরবর্তীতে আমাদের ছোট ভাই বিন ইয়ামিনকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে এক কণা খাদ্যশস্য আমাদের দেয়া হবে না। এমনকি আমাদের মিথ্যাবাদী সাজতে হবে।

—যেমন? হজরত ইয়াকুব আ. আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে দুরভিসন্ধি আছে কি না! কেননা, এই দশ সন্তানের প্রতি তিনি কখনো পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। যদিও পরিবারের সবার জন্য খাদ্য বস্ত্র যোগান দেওয়ার কাজ তারাই করে। তারা শক্ত সমর্থ যুবা পুরুষ। কিন্তু হিংসুটে, হীনমন্য। বিশেষতঃ ইউসুফ এবং বিন ইয়ামিনের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ।

ছেলেরা বললো— মিশর সম্রাট আমাদের পরিবারের সবার তালিকা নিয়েছেন। সক্ষম প্রতিটি পুরুষকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের রসদের প্রয়োজন। কাজেই এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে পরিবার পরিজন অভুক্ত থেকে মারা পড়বে। বিন ইয়ামিনকে আমাদের সাথে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমরা যদি কোনো দৈব দুর্বিপাকে না পড়ি তবে অবশ্যই তাকে সহি সালামতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবো।

—ইউসুফের বেলায়ও তোমরা এমনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে। কিন্তু তোমরা অঙ্গীকার পালন করোনি।

ইতোমধ্যে উটের হাওদা খুলতে গিয়ে ছেলেরা খাদ্য শস্যের মূল্য বাবদ যে অর্থ তারা বাদশাহ্কে দিয়েছিলো তা দেখতে পেলো। তারা মহা উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে পিতাকে বললো— আব্বাজান এই দেখুন, মহানুভব বাদশাহ্ আমাদের অর্থকড়িও ফিরিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় দফা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতে আমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না।

হজরত ইয়াকুব আ. আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোথায় যেনো গরমিল। হিসাব মিলছে না। হজরত ইয়াকুব আ. বিজ্ঞ বলেই তাঁর মনে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। মিশর সম্রাটের আতিথেয়তা, প্রচুর খাদ্যশস্য প্রেরণ, গোপনে অর্থকড়ি ফেরত এবং বিন ইয়ামিনসহ পুনরায় মিশরে যাবার আমন্ত্রণ। এ সব বিষয় তাঁর মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো। জট খুলছে না কিছুতেই।

সৃষ্টিকর্তা বিজ্ঞানময়। সব রহস্যের একমাত্র বিধায়ক। অতএব, সর্বাবস্থায় তাঁর উপর নির্ভরশীল থাকাই উত্তম।

দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থা সহসা উন্নতি হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অর্থের বিনিময়েও খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য নয়। একমাত্র মিশর সম্রাটই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আপৎকালীন সময়ের জন্য প্রচুর শস্য মজুদ করেছেন। অত্যন্ত সুচারুরূপে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের মধ্যে খাদ্যের যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। এমন না হলে হয়তো এই ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষে কতো জনপদ যে জনশূন্য হয়ে পড়তো। এর মধ্যে মহান প্রভুর কি নিগুঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে?

হজরত ইয়াকুব আ. ভাবলেন, খাদ্যের প্রয়োজনে তাঁর ছেলেদেরকে মিশর যেতেই হবে। সুতরাং হৃদয়ের টুকরো, নয়নের নিধি বিন ইয়ামিনকে তার কুচক্রী ভাইদের সঙ্গে দিতেই হচ্ছে। তিনি ধৈর্যাবলম্বনের পথই বেছে নিলেন। সর্বোত্তম হেফাজতকারীর উপরই সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে একমাত্র সহায় তো তিনিই। সাধ্য কার, তাঁর কর্ম পদ্ধতির রহস্য উদঘাটন করে। ছেলেদেরকে তিনি বললেন— ঠিক আছে, বিন ইয়ামিন তোমাদের সঙ্গে যাবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানেরা পুনরায় মিশর যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। এবারের কাফেলার প্রকৃতি ছিলো ভিন্ন। প্রথমতঃ মিশর যাত্রার মূল উদ্দেশ্য খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ হলেও মিশরাধিপতির আমন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। দ্বিতীয়তঃ ইয়াকুব আ. এর স্নেহপরায়ণ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিন ইয়ামিনও সঙ্গে যাচ্ছে। ইউসুফকে হারিয়ে বিন ইয়ামিনের মধ্যেই তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। সেই মানবিক সান্ত্বনার অবলম্বনটুকুও আজ দূরে চলে যাচ্ছে। এক অজানা আশংকায় শংকিত হয়ে উঠছেন তিনি। সন্তানেরা তার হেফাজতের

অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না হজরত ইয়াকুব। তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্যই বা কতটুকু? এ রকম অঙ্গীকার তারা ইউসুফের বেলায়ও করেছিলো। ওরা আর কি হেফাজত করবে? সৃষ্টির হেফাজতের মালিক তো স্রষ্টা নিজেই। সেই মহান স্রষ্টার প্রতি সর্বাবস্থায় নির্ভরশীল থাকাই উত্তম। তিনিই একমাত্র সহায়।

পুত্রদের উদ্দেশ্যে হজরত ইয়াকুব আ. বললেন— তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর আস্থাশীল থাকবে। মিশরে প্রবেশ করবার সময় একসংগে একই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো না। আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথে শহরে ঢুকবে। সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই এ উপদেশ। এটা কোনো রক্ষাকবজ নয়। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যা নির্ধারিত আছে তাতো ঘটবেই। নির্দেশ তার তরফ থেকেই আসে। আমি সেই পরম বন্ধুর আশ্রয়ই প্রত্যাশা করি।

হজরত ইয়াকুব আ. তাঁর সন্তানদের সাবধানতামূলক তদবিরের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ একদল নব্য যুবক মিশরের রাজপথে জনসাধারণের সন্দেহের উদ্রেক না ঘটায়। গুপ্তচর বা অন্য অভিযোগে তারা যেনো অভিযুক্ত না হয়। আল্লাহ্‌র বিধান অলংঘনীয়। কিন্তু সবকাজে সাবধানতা অবলম্বন করা আল্লাহ্‌র নবীগণের সুন্নত।

যাত্রা শুরু হলো। এগারো ভাইয়ের কাফেলা মরুভূমির দুস্তর পথ অতিক্রম করতে লাগলো।

মন যাদের নোংরা— হৃদয় যাদের নোংরামীর কালিমায় আচ্ছন্ন তারা যতোই পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গীকার করুক না কেনো, তাদের উপর কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এই দশ ভাইয়ের দলটি বারবারই তা ভঙ্গ করেছে। পিতার দৃষ্টির আড়াল হতেই তারা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলো। শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিলো। অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেলো তারা।

পথিমধ্যে তারা বিন ইয়ামিনের সাথে অসদাচরণ শুরু করলো। তারা বিন ইয়ামিনকে নানাভাবে উত্তেজিত করতে চাইলো। পিতার নয়নের নিধি, স্নেহের পুত্তলী, ভালোমানুষীর বেশে স্বার্থপরের মতো পিতৃস্নেহের পুরোটাই ভোগদখলকারী— ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতে লাগলো বিন ইয়ামিনকে। এই অকর্মণ্য অপদার্থ ঘরকুনো বিন ইয়ামিন হঠাৎ মিশর সম্রাটের নজরে কেনো পড়লো? কেনোইবা তাকে দাওয়াত দিয়ে কেনানের মরুভুমি থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিশরের রাজপ্রাসাদে ইত্যাদি বক্র কথায় ছোট সৎভাই বিন ইয়ামিনে উত্যক্ত করতে লাগলো বড় ভাইয়েরা। হজরত ইউসুফ আ. এর ছোট ভাই বিন ইয়ামিন, তাঁরই প্রতিকৃতি যেনো। ভাইদের তিক্ত কথায় কান দিলো না বিন ইয়ামিন। নীরবেই সে সব সহ্য করলো। নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার পরম করুণাময় দয়ালু

আল্লাহ্র শানে ন্যস্ত করলো। ছোট্ট কাফেলাটি মিশর পৌঁছে গেলো একসময়। তারা সবাই পিতার নির্দেশিত ভিন্ন ভিন্ন পথে মিশরের রাজ দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের হৃদয় অলিন্দে নানা কথার ঢেউ। মিশর সম্রাটের কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে? চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ করে বিন ইয়ামিনের প্রতি তাঁর নজর পড়লো কেনো? ব্যাপারটা তারা ভালোভাবে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো। দেখা যাক কি হয়। নাকি শুধু শুধুই তারা ভাবছে। হয়তো বাদশাহ্র কথাই ঠিক। অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহের সুযোগদানের জন্যই বিন ইয়ামিনকে আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কেনানের অতিথি দলের আগমনের সংবাদ হজরত ইউসুফ আ. এর নিকট জানানো হলো। তিনি ছোট ভাই বিন ইয়ামিনের দর্শন লাভের জন্য, বৃদ্ধ পিতার কুশলাদি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি সহোদরকে ডেকে পাঠালেন।

অতিথিশালা থেকে বিন ইয়ামিনকে বাদশাহ্র দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। বাদশাহ্ তাকে নিজের পাশে বসালেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের খোঁজখবর নিলেন। কথা প্রসঙ্গে বিন ইয়ামিন সৎভাইদের দুর্ব্যবহারের কথা জানালো। সে আরও জানালো অনেকদিন আগে তার আপন বড় ভাই হারিয়ে গেছে। সব শুনে হজরত ইউসুফ আ. বললেন, আমি তোমার সেই হারানো ভাই ইউসুফ। আমার সাথেও তারা খারাপ ব্যবহার করেছিলো। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ পাবে না। ধৈর্য ধরো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। দুঃখ হচ্ছে বৃদ্ধ অসহায় পিতার জন্য। জন্মদাতা পিতা তারই শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর মনে হলো এই মুহূর্তে পিতার কাছে ছুটে যান। কিন্তু সব ইচ্ছাই কি সব সময় পূরণ হয়? সব কিছুই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। দুই সহোদর আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো। আনন্দের আতিশয্যে চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হলো তাঁদের।

সেই কবেকার কথা। বিন ইয়ামিন তখন নিতান্তই ছোট। ভালোমন্দ বুঝবার বয়স তার হয়নি। সেই সময়ে দুভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ। কাজেই বিন ইয়ামিন ভাই হারানোর ব্যথা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারেনি। শুধু পিতার আহাজারী শুনে শুনে নীরবে অশ্রুপাত করেছে। পিতার দুঃখে হৃদয়ের নিভৃতে এক অব্যক্ত কান্না গুমরে গুমরে উঠেছে। তারপর বয়স বেড়েছে তার। এখন নব যৌবনে উদ্ভাসিত এক যুবক বিন ইয়ামিন। সেই ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া ভাইকে পেয়ে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বয়ে যাচ্ছে তার আনন্দ শিহরণ। আল্লাহ্র কি অপার মহিমা। সেদিনের সেই বেদুইন বালক ইউসুফ আজ মিশর সাম্রাজ্যের সর্বাধিপতি। দুর্ভিক্ষপীড়িত এক বিরাট জনপদের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বণ্টনকারী। এই সন্তানের জন্যই দূর মরুভূমির এক অখ্যাত পর্ণ কুটিরে বসে বৃদ্ধ

পিতা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর হারানো পুত্রের সন্ধান পেলে কতইনা আনন্দিত হবেন তিনি। হাজার বার আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করবেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এ শুভ সংবাদ পিতার কাছে পৌঁছাতে হবে।

হজরত ইউসুফ আ. সহোদরের মনোভাব বুঝতে পারেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তাঁর ইচ্ছার উপরই সদা নির্ভরশীল। যখন সময় হবে নিশ্চয়ই পিতা পুত্রের মিলন ঘটাবেন আল্লাহ্‌পাক। শিশুকালের সেই স্বপ্ন আস্তে আস্তে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। মহান আল্লাহ্ নিশ্চয় সূর্য, চন্দ্র এবং এগারটি তারকার সম্মিলন ঘটাবেন। সুতরাং উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

দুই সহোদর দীর্ঘক্ষণ নিভৃতে অন্তরংগ আলাপ করলেন। কতো সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, কতো স্মৃতি, কতো কথা, কিছুই যেনো ফুরোতে চায় না। কেউ কাউকে ছাড়তে চান না। কিন্তু জীবনের অমোঘ নিয়ম— এক সময় ছাড়াছাড়ি হতেই হয়। বিন ইয়ামিনকে ছেড়ে দিতে হলো। মেহমানখানায় সৎভাইদের কাছে ফিরে গেলো সে। সৎভাইদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হলো বিন ইয়ামিন। মিশর সম্রাট কেনো ডাকলো, কি আলাপ হলো, কেনোই বা তিনি কেনান থেকে মিশর পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করে আনলেন তাকে। কিন্তু বিন ইয়ামিন নিরুত্তর রইলো।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা। এবার ফিরে যেতে হবে কেনানে।

বিন ইয়ামিন প্রতিদিনই একান্তে ভাইয়ের সাথে মিলিত হতো। আর প্রতিদিনই সৎভাইদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হতো। বিন ইয়ামিন বরাবরই তাদের এড়িয়ে যেতো। হজরত ইউসুফ আ. সব সময়ই চিন্তা করতেন, বিন ইয়ামিনকে যদি নিজের কাছে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এ মনোষ্কামনা কীভাবে পূর্ণ হবে? মনের এ সুপ্ত ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার কোনো উপায় নেই। কোনো কারণ ব্যতীত কাউকে আটক রাখা আইনবিরুদ্ধ। আপনজন হিসাবে হয়তো ধরে রাখা সম্ভব। কিন্তু এখনই পরিচয় প্রকাশ হওয়া হয়তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। তাই সেই শুভক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বিন ইয়ামিনের কেনান যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। তাদের উটগুলো প্রচুর খাদ্যশস্য দিয়ে বোঝাই করে দেওয়া হলো। মিশর সম্রাটের আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য মোবারকবাদ জানিয়ে এগারো ভাইয়ের উটের কাফেলা কেনানের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাফেলাটি মিশরের রাজপথ অতিক্রম করছিলো। নিশ্চিত মনে পথ চলছিলো তারা। হঠাৎ কয়েকজন রাজকর্মচারী দৌড়ে এসে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কাফেলার লোকজন বিস্মিত হলো। কি এমন ঘটলো? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তারা রাজকর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

রাজকর্মচারীরা বললো— বাদশাহ্‌র রূপোর পানপাত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না। রাজমহলে তোমরা ছাড়া বাইরের কোনো লোক ছিলো না। বুঝতেই পারছো ঘটনাটি কি? এখন তল্লাসী ছাড়া তোমরা সন্দেহমুক্ত থাকতে পারছো না।

হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললেন, তোমরা কি আমাদের চোর সাব্যস্ত করতে চাও?

—আমরা অনুমান করছি মাত্র, বললো রাজকর্মচারীরা।

আল্লাহ্‌তায়ালা মহাজ্ঞানী, তিনিই জানেন সব কিছু। এখানে আমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি। আমরা চোরও নই। হজরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানগণ অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তেই বললো কথাগুলো।

—তোমরা জানলে সন্ধান দাও। প্রতিজ্ঞা করে বলছি, যে লোক সঠিক সন্ধান দিতে পারবে তাকে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য উপহার স্বরূপ দেওয়া হবে। রাজকর্মচারীদের একজন তাদের লোভ দেখিয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে চাইলো।

তারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো এবং পরিশেষে বললো— ব্যাপারটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

রাজকর্মচারীরা বললো— ঠিক আছে, তোমরা ফিরে চলো। বাদশাহ্‌র সম্মুখে তোমাদের বস্তাগুলো খুলে পরীক্ষা করা হবে। নির্দোষ হলে ভয়ের কোনো কারণ নেই।

সমস্ত শুনে বাদশাহ্ বললেন, হারোনো পাত্রটি যদি তোমাদের কাছে পাওয়া যায় তার শাস্তি কি?

তারা তাদের সামাজিক আইনের বিষয়টি জানালো। চোরকে চুরি যাওয়া জিনিসের মালিকের কাছে তুলে দেওয়া হবে। নিজের কৃত অপরাধের শাস্তি সে নিজেই ভোগ করবে। এটাই আমাদের নিয়ম।

বাদশাহ্ বললেন— ঠিক আছে। এবার তোমাদের বস্তাগুলো পরীক্ষা করতে দাও।

রাজকর্মচারীরা একে একে সবার বস্তা খুলে পরীক্ষা করলো। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলো না। সবশেষে বিন ইয়ামিনের বস্তা খুলতেই রূপোর পেয়ালাটি পাওয়া গেলো।

আল্লাহ্তায়ালার কি রহস্যময় কৌশল। হজরত ইউসুফ আ. তাঁর সহোদরকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাননি। অথচ সর্বজ্ঞ মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ্ কতো সহজেই উপায় করে দিলেন। তিনি তো রূপোর পেয়ালাটি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সকলের অগোচরে বিন ইয়ামিনের খাদ্য শস্যের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। যেনো কেনানে গিয়ে ভাইয়ের কথা ভুলে না যায় বিন ইয়ামিন, পিতাকেও এটি দেখিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারে। কিন্তু মহাকুশলী আল্লাহ্ নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁর প্রিয় বান্দার মনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করে দিলেন। শুকরিয়া। লাখো শুকরিয়া সেই সর্বশক্তিমান বিশ্ব স্রষ্টার দরবারে যিনি তাঁর বান্দার ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখেন না।

হজরত ইউসুফ আ. চুরির ব্যাপারে তাদের অভিমত জানতে চাইলেন। বিন ইয়ামিন চোর সাব্যস্ত হওয়ায় অপমানিত বোধ করলো সকল ভাইয়েরা। একজন রাগান্বিত কণ্ঠে বললো— বিন ইয়ামিন চুরি করেছে কিনা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। প্রকৃতই যদি সে চুরি করে থাকে তবে এটা তার পক্ষেই সম্ভব। কেননা তার বড় ভাইও চুরি করেছিলো এবং সাজা ভোগ করেছিলো।

ভাইয়েরা তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলছে। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ্ই জানেন। হজরত ইয়াকুব আ. এর এক বোন ছিলেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিলো না। ইউসুফের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ছেলেবেলায় তাকে লালন পালনের জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন হজরত ইয়াকুবের বোন। ইউসুফ এবং বিন ইয়ামিন খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁদের লালন পালনও সমস্যার ব্যাপার ছিলো। কাজেই হজরত ইয়াকুব আ.ও বোনের প্রস্তাব সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। ফুফুর আদর যত্নে বেড়ে উঠছিলেন ইউসুফ। কয়েক বছর পর হজরত ইয়াকুব আ. স্নেহের পুত্র ইউসুফকে ফিরিয়ে আনতে বোনের বাড়ীতে গেলেন। বোনের ইচ্ছা ছিলো না ইউসুফকে ফিরিয়ে দেবার। কিন্তু কীভাবে তিনি রাখতে পারেন? দীর্ঘদিন পর ভাই তাঁর সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছার উপর তো জোড় খাটানো যায় না।

ইয়াকুবী শরীয়তের আইনে চোরের শাস্তিছিলো চোর নিজে চুরি যাওয়া জিনিসের মালিকের সম্পত্তি হয়ে যেতো। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চোরকে

তাবেদারী করতে হতো মালিকের। হজরত ইউসুফ আ. এর ফুফুও ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাছে রাখবার জন্য এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ইউসুফের পরিধানের কাপড়ের সাথে নিজের সোনার হাসুলী গোপনে বেঁধে দিলেন। তারপর তাকে সাজগোজ করিয়ে ভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন। তাঁদের যাত্রার প্রাক্কালে হারিয়ে যাওয়া হাসুলীর কথা প্রচার করলেন ফুফু। শুরু হলো খোঁজাখুঁজি। শেষমেশ ইউসুফের কোমরের কাপড়ের মধ্যে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেলো হাসুলিটি।

আল্লাহ্‌র নবী হজরত ইয়াকুব আ.। তিনি বোনের চালাকী ঠিকই বুঝে ফেললেন। কিন্তু আইনের বরখেলাপ করা যাবে না। বোন সন্তানহীনা। ইউসুফকে দিয়ে সন্তানের অভাব পূরণ করতে চান তিনি। বাধ্য হয়ে তিনি প্রাণপ্রিয় সন্তানকে বোনের কাছেই রেখে এলেন। ফুফু জীবিত থাকা পর্যন্ত হজরত ইউসুফ আ. আর কাছেই ছিলেন।

এই হলো প্রকৃত ঘটনা। ভাইদেরও তা অজানা নয়। কিন্তু তারা প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে প্রচার করছে। ভাইদের কথার প্রতিবাদ করলেন না হজরত ইউসুফ। মনে মনে বললেন, তোমাদের জন্য নির্ধারিত আছে নিকৃষ্টতম স্থান।

ভাইদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন— বিচারে তোমাদের রায়ই আমরা মেনে নিচ্ছি। যার কাছে মাল পাওয়া গেছে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাকেই আমরা রেখে দেবো।

মিশরপতির মনোভাব বুঝতে পেরে দশ ভাই অত্যন্ত মুষড়ে পড়লো। পিতার কাছে দেয়া পাকা ওয়াদার কথা স্মরণ হলো তাদের। বিন ইয়ামিনকে ফেলে তারা কীভাবে পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। তারপর বাদশাহ্‌র দরবারে আরজি পেশ করলো— আপনি মহানুভব বাদশাহ্। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল বিধান করুন। আপনি আমাদের বৃদ্ধ পিতার প্রতি অনুগ্রহ করুন। বিন ইয়ামিনের বড় ভাইকে হারিয়ে ওকে অবলম্বন করেই বেঁচে আছেন পিতা। ওকে তিনি অত্যন্ত মহব্বত করেন। ওকে না দেখলে ভেঙে পড়বেন তিনি। আপনি বরং আমাদের একজনকে রেখে ওকে ছেড়ে দিন। আমাদের বৃদ্ধ পিতার প্রতি সদয় হোন।

বাদশাহ্ বললেন— তা কী করে হয়? অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না আমি। এমন অন্যায় আবদার তোমরা করো না। তারা বাদশাহ্‌কে অনেক অনুনয় বিনয় করলো। কিন্তু বাদশাহ্ তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। বিফল মনোরথ হয়ে তারা বাদশাহ্‌র দরবার থেকে ফিরে এলো এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো।

এ সংকটে করনীয় কী ভেবে পেলো না তারা। বিন ইয়ামিনকে ছাড়া কোন মুখে পিতার সম্মুখে দাঁড়াবে? বয়োজ্যেষ্ঠ বললো— তোমরা ফিরে যাও। পিতার সামনে কথা বলার মতো হিম্মত আমার নেই। ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা

এরকম করেছিলে। বিন ইয়ামিনের হেফাজতের জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বার বার আমরা প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী প্রমাণিত হচ্ছি।

অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা শেষ কয়েকদিন অতিবাহিত করলো। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না। এভাবে তো চলতে পারে না। একদিন না একদিন দেশে ফিরতে হবে। পিতার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বিন ইয়ামিনের ব্যাপারে সঠিক কথাই তারা পিতাকে জানাবে। বয়োজ্যেষ্ঠ অভিমত দিল— আমরা জানি না সে চুরি করেছে কিনা। এ ব্যাপারে আমরা সীমা লংঘন করিনি। কাফেলার অন্যান্য লোকজনও তা প্রত্যক্ষ করেছে। অবশেষে তারা কেনানের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

বিন ইয়ামিনের সংবাদ শুনে হজরত ইয়াকুব আ. প্রচণ্ড আঘাত পেলেন মনে। বেদনার ঝড় উঠলো হৃদয়ে। ক্ষত বিক্ষত অন্তরাঙ্গন। কিন্তু ভেঙে পড়লেন না তিনি। নিজেকে শান্ত রাখলেন। চুরির সাথে বিন ইয়ামিনের সম্পর্ক থাকতে পারে না। এটা তাঁর কুচক্রী সন্তানদের সাজানো কথা। তাদের হঠকারিতায় তিনি বিস্মিত হলেন না। তিনি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করলেন। সর্বাবস্থায় সেই মহাপ্রভুর অনুগ্রহের প্রত্যাশাই তো নবী রসুলগণের বৈশিষ্ট্য।

হজরত ইয়াকুব আ. এর ধৈর্যের পরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হবে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানি হলে একদিন তিনি তাঁর হারানো পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। তাঁর অনুগ্রহের প্রতি শয়নে জাগরণে সবসময়ই নবী ইয়াকুব আ. আস্থাশীল। তবুও তিনি মানুষ। তিনি পিতা। তিনি জন্মদাতা। এই মানবীয় অনুভূতি তাঁকে বেদনার্ত করে— কাঁদায়।

বেশ কিছুদিন গত হলো। তিনি ছেলেদের ডেকে বললেন— তোমরা আবার মিশর যাও। ইউসুফ এবং তার ভাইয়ের অনুসন্ধান করো। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হলে তাদের সন্ধান পেতেও পারো।

ছেলেরা বললো— সেই পুরনো স্মৃতি লালন করে আপনি নিজের জীবন ধ্বংস করছেন মাত্র। ইউসুফ তো সেই কবে হারিয়ে গেছে। অসম্ভবকে আপনি সম্ভব করতে চাইছেন। এসব ভেবে লাভ নেই।

পিতা বললেন— অবিশ্বাসী মূর্খরাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন। সেই ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলোকেই বলছি, আমি এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। সুতরাং নিরাশ হয়ো না। তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকো। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।

দুর্ভিক্ষ এখনো প্রকট। খাদ্যের মজুদ প্রায় শেষ। অতি সত্বর প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করতে না পারলে পরিবার পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়তে হবে।

ভাবছে হজরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানেরা। পিতাও পিড়াপীড়ি করছেন। এতোকাল পরে নতুন করে ইউসুফের অনুসন্ধানের চিন্তা পাগলামীরই নামান্তর। বিন ইয়ামিনের মুক্তির জন্যও তারা তেমন আগ্রহী নয়। খাবার ফুরিয়ে আসছে। এজন্যই তারা পুনরায় মিশর যেতে প্রস্তুত হলো। কিন্তু পাথেয় খুবই সামান্য। প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার জন্য যথেষ্ট নয়। তবু যেতে হবে।

দুস্তর মরুভূমি পাড়ি দিয়ে হজরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানেরা আবার মিশর উপস্থিত হলো। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মিশররাজের কাছে নিজেদের আরজি পেশ করলো— আপনি মহানুভব বাদশাহ্। আপনি জানেন, দুর্ভিক্ষের ভয়াল থাবায় আমরা ক্ষত-বিক্ষত, নিঃস্ব। উপযুক্ত মূল্য দিয়ে খাদ্য কেনার সঙ্গতিও নেই। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে খাদ্যশস্য প্রদান করুন। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল বিধান করবেন।

সৎভাইদের মিসকিনের মতো অবস্থা এবং নিজ পরিজনদের অসহায় পরিস্থিতির কথা ভেবে হজরত ইউসুফ আ. এর মন ব্যথিত হয়ো উঠলো। তিনি ভাবলেন, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আজ তিনি মিশরের সর্বাধিপতি। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদে খাদ্য বিতরণকারী। অথচ তারই স্বজনরা ক্ষুধায় কাতর। একমুঠো অন্নের জন্য তারা বার বার ছুটে আসছে কেনান থেকে সুদূর মিশর। তিনি ব্যথিত। মর্মাহত। এখন আর চুপ করে থাকা উচিত হবে না। পরিচয় প্রকাশের এইতো সময়। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছাও তাই ছিলো।

প্রসঙ্গক্রমে বাদশাহ্ সৎভাইদের উদ্দেশ্য করে বললেন— তোমাদের এখন এই অবস্থা যে, খাদ্য কেনার প্রয়োজনীয় অর্থও নেই। তোমরা সেই মহা বিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে দূরে সরে গেছো। তোমরা কি ইউসুফকে মনে রেখেছো? তাঁর সাথে কি ব্যবহার করেছিলে মনে পড়ে কি?

ইউসুফ! কোথায় কেনান আর কোথায় মিশর। কতো দীর্ঘ সময়। এতোকাল পরে মিশরের রাজ দরবারে ইউসুফের প্রসঙ্গই বা কেমন করে ওঠলো। তারা ভীত, উৎকণ্ঠিত এবং বিস্মিত হলো। বাদশাহ্র কথায় কিসের যেনো ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। তাদের সকলের দৃষ্টি একযোগে বাদশাহ্র উপর নিপতিত হলো। সেই ছোট্ট বেলার ইউসুফ তার চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার বিশ্লেষণ করে তারা ইউসুফকে আবিষ্কার করলো। কিন্তু এ কি করে সম্ভব।

-আপনিই কি ইউসুফ? তারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

-হ্যাঁ। আমিই ইউসুফ। তোমাদের জানের-প্রাণের দুশমন। যাকে তোমরা মৃত্যু গহ্বরে নির্দ্বিধায় ঠেলে দিতে তৎপর হয়েছিলে।

ভাইদের মস্তক তখন অবনত হয়ে পড়েছে। কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছে তারা। তাদের এহেন করুণ অবস্থা দেখে ইউসুফ আ. বললেন—

—ভাইয়েরা, তোমরা কুণ্ঠিত হয়ো না। তোমাদের আমি দোষারোপ করছি না। শয়তান আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। একটা বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করে আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো। তোমাদেরকে অপরাধ প্রবণতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি তোমাদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই মেহেরবান।

সৎভাইয়েরা হজরত ইউসুফ আ. এর ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হলো। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো তারা। ইউসুফ তাদের আজ পাকড়াও না করে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এবার হজরত ইয়াকুব আ. পরিবারের মহাসম্মিলনের প্রস্তুতিপর্ব। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নতুন করে তৈরী হলো সুখ-শান্তি আর ভালোবাসার মহীসোপান।

একটা সময় আসে যখন মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে চায়। অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে। নিজেকে নতুন করে ভাবতে শিখে। হজরত ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা আজ লজ্জিত, অনুতপ্ত। এক মহান সম্রাটের ভাই তারা। এজন্য তারা আজ গর্বিত।

ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনপর্ব সমাপ্ত হলো। নবী ইউসুফ আ. ভাইদের বললেন—তোমরা শীঘ্র পরিবার পরিজন নিয়ে চলে এসো। পিতার দর্শন লাভের জন্য আমি উদগ্রীব। আর এই নাও আমার পরিধানের জামা। এটি পিতার চোখের উপর রাখলে ইনশাল্লাহ্‌ তাঁর অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ভোরের আলো না ফুটতেই হজরত ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা কেনান রওনা হলো। তারা ছুটছে। এক অদৃশ্য শক্তি বলে ছুটে চলছে গৃহের দিকে। তারা শোকার্ত পিতার জন্য সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর হারানো সন্তানের সাফল্যের সংবাদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মিশর থেকে সুদূর কেনানে।

ওদিকে হজরত ইয়াকুব আ. ঘুম থেকে জেগে উঠেই পরিবারের সবাইকে ডেকে বললেন— তোমরা হয়তো আমার কথা বিশ্বাসই করবে না। কিংবা ভাববে আমার মতিভ্রম হয়েছে। কিন্তু, সত্য বলছি, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।

আল্লাহ্‌র নবীর কথা পরিবারের কেউ বিশ্বাস করতে পারলো না। তারা ভাবলো— তিনি সেই পুরনো স্মৃতি নিয়েই স্বপ্ন দেখছেন। এ কখনো হতে পারে না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগের ইউসুফ তো এখন শুধু এত ধুসর স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়।

নবী ইয়াকুব ভাবছেন— মানুষ কতো অকৃতজ্ঞ। মহাপ্রভুর একটি মাত্র হুকুমে সৃষ্ট এ পৃথিবীতে বসবাস করেও তাঁর অসীম কুদরতের কথা বিশ্বাস করে না। অথচ তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। নতুন কিছু সৃষ্টি এবং ধ্বংস সংঘটিত হওয়া তাঁর একটি মাত্র হুকুমেই হতে পারে।

নবী জানতেন, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সেজন্যই তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ধৈর্যের যন্ত্রণাদগ্ধ অধ্যায়ের অবসান হবে এবার।

অবশেষে ছেলেরা ফিরে এলো। চিন্তামগ্ন পিতার সামনে এসে দাঁড়ালো দশভাই। সর্বাগ্রে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইয়াহুদা। এই ইয়াহুদাই ইউসুফের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ পিতার কাছে পৌঁছিয়েছিলো। তার মনে অনুশোচনা জেগেছে সবচেয়ে বেশী। তাই সুসংবাদটিও পিতার কাছে প্রথম পৌঁছে দিলো সে-ই।

—আমরা এসেছি আব্বাজন।

তিনি বললেন— আমি জানি তোমরা ইউসুফের সংবাদ নিয়ে এসেছো। সে কেমন আছে?

তারা বললো— স্বয়ং ইউসুফই মিশরের বাদশাহ্ এবং বিন ইয়ামিন তাঁর হেফাজতেই আছে।

পিতা বললেন— সে বাদশাহ্ কি মিসকিন আমি তা জিজ্ঞেস করিনি। আমি জানতে চাইছি, দ্বীন ধর্মের উপর সে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা।

ছেলেরা বললো— আমরা তাঁকে পুরোপুরি ইনসাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত দেখেছি।

হজরত ইয়াকুব আ. খুশী হলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সংবাদ পেয়েও তাঁর দুনিয়াবী অবস্থান, তাঁর স্বাস্থ্য, পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে বিদগ্ধ পিতা কিছুই জানতে চাননি। তিনি জানতে চেয়েছেন দ্বীন ধর্মের উপর তাঁর কতোদূর উন্নতি হয়েছে। নবুয়তী আচরণ এরকমই।

ইয়াহুদা বললো— পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদেরকে সত্বর মিশর রওনা হতে বলেছেন ইউসুফ। আর এই নিন তাঁর পরিধানের জামা-বলেই সে জামাটি

হজরত ইউসুফ আ. এর নির্দেশ মতো পিতার দৃষ্টিহীন চোখের উপর রাখলো। কি আশ্চর্য! মুহূর্তের মধ্যে হজরত ইয়াকুব আ. দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

উল্লেখ্য যে, হজরত ইউসুফ আ. ছিলেন সুন্দরতম পুরুষ। পৃথিবীতে বাস করলেও তাঁর শরীর মোবারক ছিলো পৃথিবীর সূক্ষ্মতম প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁর শরীর ছিলো অবিকল বেহেশতী শরীর। তাই তাঁর পরিধানকৃত বস্ত্রও ছিলো অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন। দশভাই যখন কৃত্রিম রক্ত মেখে তাঁর ব্যবহৃত জামা পিতাকে দেখিয়েছিলো, তখন ঐ জামা দেখেই ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন হজরত ইয়াকুব। তার ব্যবহৃত জামার কারণেই জুলেখার অপবাদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন হজরত ইউসুফ এবং পিতার অন্ধত্বও ঐ জামার মহিমাতেই দূর হয়েছে।

নবী ইয়াকুবের চোখে তখন আনন্দাশ্রু। মনে মনে তিনি আল্লাহ্‌র রহমতের শুকরিয়া আদায় করলেন। নবী ইয়াকুব দেখলেন, সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দশ সন্তান। মনে হচ্ছে অতীত কৃতকর্মের জন্য তারা অনুতপ্ত। এই দশ সন্তানের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন— কিছু বলবে বাচারা?

তারা বললো— আপনি মহান পিতা, আমরা অপরাধী। আমাদের পাপ স্খলণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন।

পিতা বললেন— সময় হলে তোমাদের পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।

দীর্ঘদিন পর মরুভূমির বাতাসে স্নিগ্ধ সজীবতার সঞ্জীবনী স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে। যেনো শুষ্ক বালুকারাশিতে সতেজ সুখানুভূতি ফিরে এসেছে আবার। দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোর মধ্যে ফিরে এসেছে নতুন প্রাণের স্পন্দন। চারদিকে সাজ সাজ রব। কেনানের বনী ইসরাইলীরা জেগে উঠেছে। আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস-মাটি-মানুষ।

বহুদিন পর হজরত ইয়াকুব আ. হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। হৃদয় নদীতে জেগেছে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমতের জ্যোতির্ময় জোয়ার। প্রাণপ্রিয় ইউসুফের সুসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ বয়সেও দেহে তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে যেনো। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি মরুবাসী কেনানী বনী ইসরাইলীদের কুটিরে কুটিরে সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। পরিজন স্বজনদেরকে জানিয়ে দিলেন মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের পবিত্র পয়গাম।

—হে মরুবাসী বনী ইসরাইল! তোমরা সুসংবাদ শোনো। তোমাদের দুঃখের অবসান হবে। তোমরা তৈরী হয়ে নাও। মিশর সম্রাটের দাওয়াত কবুল করতে হবে এবার। সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। মরুজীবনের দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা শুরু হলো। উটের কাফেলা এগিয়ে চলেছে। কেনানের সকল বনী ইসরাইলী গোত্র পরিবার পরিজন নিয়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে সুদূর মিশরে। স্বপ্নের দেশ মিশর। সম্মুখে সম্ভাবনাময় জীবনের হাতছানি। পিছনে সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমি কেনান।

কথায় বলে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ। কেনানের জীবন যতোই কঠিন, রুক্ষ আর সংগ্রামমূলক হোক না কেনো আজ বিদায় লগ্নে মনকে ব্যাথাতুর করে তুলছে। হৃদয়ের নিভৃত অলিন্দে এক অব্যক্ত ব্যথা গুমরে গুমরে মরছে। সবার চোখই অশ্রুভারাক্রান্ত। সকলেই বার বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে। চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে কেনানকে। আজই তারা প্রথম অনুভব করলো জন্মভূমির প্রতি মানুষের টান কতোটুকু। এক সময় দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেলো কেনান। বিদায় কেনান! বিদায়!

কাফেলার পুরোভাগে আছেন নবী ইয়াকুব আ.। তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কাফেলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা মিলে মোট তিরানব্বই জন বনী ইসরাইলী মিশরের পথে রওনা হয়েছে।

কেনানের প্রতি নবী ইয়াকুবের কোনো মোহ নেই। নেই কোনো বন্ধন। কোনো নবী রসুলগণের তা থাকে না। দুনিয়ার বিত্ত বৈভবের প্রতি তাঁদের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। তাঁরা তো দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা। বিশেষ দায়িত্ব পালনই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন তাঁর একবিন্দু বেশীও দুনিয়ার প্রতি তাদের টান নেই।

কেনানী উটের কাফেলা এগিয়ে চলেছে। বয়ঃবৃদ্ধ হজরত ইয়াকুব আ. কাফেলার প্রধান ব্যক্তিত্ব। মাথার উপর আগুন ঝরা রোদ। নিচে তপ্ত বালু। বাতাস তেতে আছে। গায়ের চামড়া পুড়ে যেতে চায়। এরই মধ্যে এগিয়ে চলে কাফেলা। পথ যেনো শেষ হতে চায় না। আর কতোদূর সেই মিশর। কতোদিনে শেষ হবে এই দীর্ঘ পথ যাত্রা। কবে দেখা হবে প্রাণপ্রিয় পুত্র ইউসুফের সাথে। মাত্র আট দিনের পথ। অথচ মনে হচ্ছে কতো কাল ধরে দুস্তর মরুপথে চলেছেন কেনানীরা।

বস্তুতঃ মিশরের প্রতি হজরত ইয়াকুব আ. এর ব্যক্তিগত কোনো আকর্ষণ নেই। রাজকীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিত্তবৈভব তাঁর কাম্য নয়। তাঁর হারানো ধন সেখানে রয়েছে। ইউসুফের আকর্ষণ অবিকল আখেরাতের আকর্ষণ। তাঁর পবিত্র অজুদ যে অবিকল বেহেশতী অজুদ।

হজরত ইউসুফ আ. আজ উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে বহাল তবিয়তে মিশরের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন। আর একই সংগে হজরত ইয়াকুব আ. এর ধৈর্যের পরীক্ষাও নিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ ধৈর্যশীল বান্দাদের পছন্দ করেন। ধৈর্যের পরীক্ষায় হজরত ইয়াকুব আ. উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিতাপুত্রের মিলনের মধ্য দিয়েই এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। পিতাপুত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রসার ঘটবে। সেই একক সত্তার তৌহিদী ঝাণ্ডা মিশরের আকাশে সগর্বে শোভা পাবে। এটাই মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়।

আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের অন্ত নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে, তাঁর ইচ্ছাতেই আবার মিলন হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই দীর্ঘদিন স্নেহময় পিতা পুত্রের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। হজরত ইউসুফকে সবকিছু জেনে বুঝে আপনজনদের ব্যাপারে নীরব থাকতে হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান অনতিক্রম্য অনড়।

হজরত ইউসুফ আ. পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন নগর প্রান্তে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর পিতাপুত্রের মিলন হবে। এ মিলন বেহেশতি মিলন। পিতা-পুত্রের এ মিলন আল্লাহ্ প্রেমের এক বিরল নিদর্শন।

অবশেষে একদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটলো। বনী ইসরাইলী কাফেলা এক শুভ অপরাহ্নে মিশরের নগরপ্রান্তে এসে থামলো। ক্লান্ত শ্রান্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নীলনদ অববাহিকার শস্য শ্যামলীমার নরোম বাতাসে সতেজ অনুভূতি ফিরে পেলো। ওদিকে পিতার আগমনের সম্ভাব্য দিনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে পিতাকে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন হজরত ই্উসুফ আ.। দূরে তাকিয়ে দেখলেন এগিয়ে আসছে উটের কাফেলা। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। পিতার উটের পাশে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লেন। পিতাকে নামতে সাহায্য করলেন। তাঁরা পরস্পরকে জাড়িয়ে ধরলেন। অনেক-অনেকক্ষণ। এ বন্ধন যেনো ছিন্ন হবার নয়। উভয়ের চোখে আনন্দাশ্রু। পিতাপুত্রের এ অভূতপূর্ব মিলনদৃশ্য দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলো না কেউ।

মাটিতে-বাতাসে অন্তরীক্ষে বেজে উঠলো ইসলামের বিজয় নিনাদ। মিশর রাজ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রসারের শুভ সূচনা হলো। যুগে যুগে ইসলাম এভাবেই আলোকবর্তিকা নিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জমান জনপদে প্রবেশ করে। মানুষকে দেয় সঠিক পথে চলার নির্দেশ।

মিশরের রাজ দরবার। রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন নবী ইউসুফের পিতা-মাতা। অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং রাজ কর্মচারীগণও যার যার আসনে সমাসীন। নবী ইউসুফ দরবারে আসন নিলেন। দরবারের সমস্ত লোকজন, পিতা-মাতা এবং ভাইয়েরা সবাই তাঁকে সম্মানসূচক সেজদা করলো।

নবী ইউসুফ, এগারোভাই এবং পিতা মাতার উদ্দেশ্যে বললেন— এই হলো চল্লিশ বছর আগের সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ। মহান আল্লাহ্ এভাবেই তাঁর বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরত ইউসুফ আ. একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের সময় পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হন। চল্লিশ বছর বয়ক্রমকালে মিশরের বাদশাহী পান এবং সত্য ও ন্যায়ের শাসন কায়েম করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর মধ্যে বিভিন্নমুখী গুণাবলীর সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এবং এজন্যই ক্রীতদাস হয়েও বাদশাহী তখ্‌তে বসতে পেরেছিলেন।

হজরত ইউসুফ আ. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ছিলেন। একই সংগে তিনি নবুয়তী ও বাদশাহী দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর সময়ে মাত্র তিরানব্বইজন বনী ইসলাইলী মিশরে পুনর্বাসিত হয়। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে মুসলমানদের এ সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষে। এই সংখ্যা থেকে বোঝা যায় নবী ইউসুফের প্রচেষ্টায় মিশরে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো।

আজিজে মিশরের মৃত্যুর পর মিশর সম্রাটের উদ্যোগে হজরত ইউসুফ আ. এবং জুলেখার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিশ্বস্রষ্টার কি অপার মহিমা। এক সময় আজিজ ঘরণী জুলেখা নবী ইউসুফের প্রেমে উন্মাদিনী হয়েছিলেন। অথচ নবীর জন্য সে প্রেম ছিলো নিষিদ্ধ। যখন উভয়ের মধ্যে মিলনের সকল বাধা দূরীভূত

হলো, তখন সে প্রেমে তারুণ্যের উন্মাদনা ছিলো না— বরং তা ছিলো পরিণত এবং পবিত্র। তাই নবী ইউসুফ অনুযোগ করে বলতেন, জুলেখা তুমি বোধ হয় আগের মতো আমাকে ভালোবাসো না।

জুলেখার গর্ভে নবী ইউসুফের দুটি পুত্র সন্তান ইফরায়ীম এবং মনশা এবং একটি কন্যা সন্তান রহমত বিনতে ইউসুফ জন্মগ্রহণ করেন। হজরত আইয়ূব আ. এর সঙ্গে কন্যাটির বিয়ে হয়েছিলো।

হজরত ইউসুফ আ. অত্যন্ত দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বনী ইসরাইলীরা এক সময় এদেশে অবাঞ্ছিত হবে। আমালিক শাসকদের অত্যাচারে তারা এদেশ ত্যাগে বাধ্য হবে। তাই তিনি বনী ইসরাইলীদের অসিয়ত করেছিলেন— তোমরা যখন এদেশ থেকে চলে যাবে তখন আমার মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং ফিলিস্তিনে আমার পিতার কবরের পাশে সমাহিত করবে।

বনী ইসরাইলীরা যখন ক্ষমতাচ্যুত হলো তখন থেকেই আমালিক ফেরআউনরা বনী ইসরাইলীদের উপর অত্যাচার শুরু করলো। তারপর এক সময় আল্লাহ্‌র নির্দেশে হজরত মুসা আ. ছয় লক্ষ মুসলমান নিয়ে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে মিশর ত্যাগ করেন। যাবার সময় অনেক খোঁজাখুঁজি করে নীলনদের তীর থেকে মাটি খুঁড়ে মর্মর পাথরের কফিনে রক্ষিত হজরত ইউসুফ আ. এর মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষগণের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করেন।

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

ISBN
984-70240-0034-5